বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

শ্রীনরেশচন্দ্র জানা,
এম.এ., পি-এইচ.ডি., ডি.লিট.

সন্ধ্যা লাইব্রেরী

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ কর্তৃক প্রবর্তিত
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর নূতন পাঠক্রম (১৯৮৪) অনুসারে লিখিত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

আদি ও মধ্য যুগ

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ

শ্রীনরেশচন্দ্র জানা, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট.,
স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত
রীডার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সন্ধ্যা লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক
শ্রীসুধীরকুমার দাস
২২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : জুলাই। ১৯৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল। ১৯৮৫

ভারত সরকারের আনুকূল্যে স্বল্প মূল্যের কাগজ মুদ্রিত

মূল্য : নয় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬

SYLLABUS (Class XI & XII)

History of Bengali Literature

১। বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব ; বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন এবং যুগবিভাগ

২। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ—চর্যাপদ : সমাজচিত্র ও সাহিত্যসম্পদ

মধ্য যুগ

১. তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি—সামাজিক অবস্থা

২. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী

বিঃ দ্রঃ—চণ্ডীদাস-সমস্যার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

৩. (ক) কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ (খ) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (সংক্ষিপ্ত পরিচয়) (গ) সংক্ষেপে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর পরিচয়

৪. মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবন

৫. মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা (বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ)

৬. সাহিত্য ও সমাজজীবনে চৈতন্যদেব

৭. চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা (দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরাম)

৮. চৈতন্যজীবনীসাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয় (বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ মিশ্র, কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

৯. বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের পদাবলী

১০. ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা : রূপরাম চক্রবর্তী (সংক্ষিপ্ত পরিচয়), প্রধানতঃ ঘনরাম চক্রবর্তী

১১. কাশীরাম দাসের মহাভারত

১২. আরাকান রাজসভার প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা : দৌলতকাজী, সৈয়দ আলাওল

১৩. ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

১৪. সামাজিক পটভূমিতে শাক্তপদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত) এবং বাউল (লালন ফকির)

সূচীপত্র

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব, বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন এবং যুগবিভাগ

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাঙালী জাতির আত্মবিকাশের ইতিহাস। বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর প্রাণে যত ভালবাসা বাঙালীর হাজার বছরের সাহিত্য-সাধনায় ধরা পড়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা জাতির সেই জীবন-প্রবাহের তরঙ্গ-স্পন্দন অনুভব করতে পারি। একটি জাতির দেশ-কাল-জনজীবনের সঙ্গে তার সাহিত্যসৃষ্টির ধারা অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার আগে তাই বাঙালী জাতির পরিচয় জানা প্রয়োজন। বাঙালী কারা? বাংলাদেশের অধিবাসীই বাঙালী। বাংলাদেশ কোন্‌টি? ভাষা নিয়ে দেশ। যে দেশের ভাষা বাংলা তাই বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বলতে কোন্ ভূখণ্ডকে বোঝাব? কবির ভাষায় বলতে পারি—

> বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমালা,
> ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
> সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গভঙ্গে—
> আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

ঐতিহাসিক বলেন—"উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটানরাজ্য; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ-উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর"—এই আমাদের বাংলাদেশের সীমানা। বাংলা ভাষারও। আজকের রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের চেহারা পরিবর্তিত হলেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাঙালী জাতির প্রাণ-মন-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত অখণ্ড ও অব্যাহত রয়েছে। আমরা এখানে সেই অখণ্ড বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিকথা আলোচনা করব।

আমাদের বাংলাদেশের নাম কেমন করে বাংলা হল? কবে থেকে হল? কত প্রাচীন এই নাম? পণ্ডিতদের মতে, আমাদের এই বাংলাদেশের 'বাংলা' নামটি তেমন প্রাচীন নয়। এদেশে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান-শাসন শুরু হবার কাল থেকেই খুবসম্ভব বাংলা ভাষাভাষীর দেশ বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়। ফারসী

'বঙ্গালহ্' থেকে পোর্তুগীজ Bengala এবং পরে ইংরেজদের মুখে উচ্চারণে Bengal দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা ইংরেজীতে বাংলাদেশকে Bengal বলি।

মুসলমান-শাসন শুরু হবার আগে পর্যন্ত বাংলা দেশের কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এদেশ সমগ্রভাবে সাধারণত 'গৌড়' বলে উল্লিখিত হত। তার আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। মোটামুটি চারটি নাম ধরা যেতে পারে—(১) বঙ্গ (এখনকার সুন্দরবন-খুলনা-ফরিদপুর-ঢাকা-ময়মনসিংহ), (২) সমতট (ত্রিপুরা-সিলেট-নোয়াখালি অঞ্চল), (৩) রাঢ় (মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী) ও (৪) বরেন্দ্র (বর্তমান উত্তরবঙ্গ)।

এই চারটি নামের মধ্যে 'বঙ্গ' নামটিই প্রাচীনতম। ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই নাম পাওয়া যায় না বটে, তবে ঐতরেয় আরণ্যকে (খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে লেখা) আছে। এই 'বঙ্গ'ই বাংলাদেশ নামের মূলে রয়েছে, কারো কারো ধারণা। এঁদের মতে এদেশের জমির সীমানিধারণের জন্য দেওয়া বাঁধকে আল বলা হত। এই আলে ভরা দেশ নাম পেল 'বঙ্গাল' (বঙ্গ+আল) এবং পরে তা থেকেই 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি। যাই হোক, 'বঙ্গাল' শব্দ থেকেই বাংলা শব্দের উৎপত্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন বাঙালী জাতির উদ্ভব কেমন করে হল, বলছি।

বহু প্রাচীন যুগে, তা প্রায় আজ থেকে চারহাজার বছরেরও বেশী আগে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ বেয়ে এসে এক সুগৌর, উন্নতনাসা, দীর্ঘাকৃতি জাতি সিন্ধুনদীর তীরে বসবাস শুরু করে। ইতিহাসে এরাই আর্যজাতি নামে পরিচিত। এই আর্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের বাংলাদেশ ও তার আদি অধিবাসীদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত না। এদের ভাষাকে তারা 'বয়াংসি' অর্থাৎ 'পাখীর কিচির-মিচির ডাক' বলে বিদ্রূপ করত। শুধু তাই নয়—এরা যাতে জ্বরে ভুগে মরে, সেজন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করত। দেশভ্রমণ করতে করতে কোন আর্যযুবক এদেশে এসে পড়লে তাকে তারা ঘরে নিত না। 'ব্রাত্য' অর্থাৎ অপাংক্তেয় করে রাখত। এদেশে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাষাভাষী যারা বাস করত—তারা এদের কাছে ছিল অন্-আর্য অর্থাৎ অনার্য। অষ্ট্রিক ভাষাভাষীরা ছিল খর্বাকার। এদের মাথার খুলি লম্বা, নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গায়ের রঙ কালো। বর্তমান কালের কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদির পূর্বপুরুষ ছিল এরা। দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা ছিল মধ্যাকার। এদের মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও গায়ের রঙ ময়লা। ওঁরাও প্রভৃতি জাতের এরা পূর্বপুরুষ। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী এই অনার্যদের ধর্মকর্ম, আচার-আচরণ তাদের পছন্দ ছিল না। কিন্তু একদিন এদেশাগত কোন আর্যযুবকের কাছে সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা বাংলাদেশের সমৃদ্ধির পরিচয় পেয়ে তারা এখানে

আসা শুরু করল। এ দেশ সম্পর্কে তাদের উন্নাসিকতা লোপ পেল, ঘৃণা দূর হল, দলে দলে আর্যেরা আসতে লাগল। ঠিক কোন্ সময়ে তারা আসা শুরু করেছিল, তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দিকেই তারা এদেশে আসা শুরু করে এবং অল্পকালের মধ্যেই এদেশের অধিবাসীদের পরাজিত করে সমগ্র বাংলাদেশ অধিকার করে নেয়। পণ্ডিতদের ধারণা, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গুপ্ত রাজাদের শাসনের যুগে আর্যদের শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি এদেশের আদিম অধিবাসীরা গ্রহণ করে ফেলে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, যখন কোন প্রবল উন্নত জাতি ও দুর্বল অনুন্নত জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন দুর্বল জাতি নিজেদের সত্তা হারিয়ে সবল জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই গ্রহণ করে। বাংলাদেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বহিরাগত আর্যজাতির ও স্থানীয় অনার্যজাতির সংমিশ্রণে এক নতুন জাতির অভ্যুদয় হল—তাই-ই বাঙালী জাতি। এবারে ইতিহাসে বাঙালী জাতি কেমন করে স্বমহিমায় স্থান পেল, তাই আলোচনা করছি।

আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে যে জাতির জন্ম হল, তার বিশিষ্ট সন্তান রাজা শশাঙ্ক। শশাঙ্কের অভ্যুদয় থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ইতিহাসের পটে স্থান পেল। হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে কিছুকালের জন্য কর্ণসুবর্ণের (আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি গ্রাম) রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত (সপ্তম শতাব্দী) বাংলাদেশকে ঐতিহাসিক গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। শশাঙ্ক বাংলার বাহিরে উত্তরাপথ পর্যন্ত তাঁর অধিকার বাড়িয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশ ভীষণ অরাজকতার সম্মুখীন হল। প্রায় একশো বছর ধরে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চলল। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রজারা সমবেত হয়ে গোপালদেব নামে এক সাধারণ ব্যক্তিকে বাংলার রাজসিংহাসনে রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন। অষ্টম শতাব্দীতে গোপালদেব যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন, তাই ইতিহাসে পালবংশ নামে খ্যাত। এই পালবংশের আমলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল এবং এই রাজবংশের আমলকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'আদি যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় চারশো বছর ধরে পালরাজারা খুব কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলাদেশ শাসন করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটি ও সামন্ত-চক্রান্তের ফলে পাল-সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। বাংলার এই রাষ্ট্র-সঙ্কটের দিনে বাংলার সিংহাসন অধিকার করলেন সুদূর দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী সেনবংশ। পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, আর এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যাদর্শের ধারক ও বাহক। সেনবংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন কর্ণাটক ত্যাগ করে রাঢ়দেশে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁরই

পৌত্র বিজয়সেন বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন এবং পৌত্র লক্ষ্মণসেন সেনরাজবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলেন এবং মোট সাতাত্তর বছর বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। লক্ষ্মণসেনের আমলে আবার বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে রাষ্ট্রসঙ্কট ঘনিয়ে আসে এবং রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পালাবাদল হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে বখ্‌তিয়ার খিলজী নামক এক তুর্কী সেনানায়কের অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড় ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। এর ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের কিয়দংশে মুসলমান-শাসনের স্থচনা ঘটে। ক্রমে ক্রমে বাংলার প্রায় সবটাই এঁদের অধিকারভুক্ত হয়। পাঠান স্থলতান ও মোগল সম্রাটরা প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে বাংলাদেশ শাসন করেন। এই মুসলমান-শাসনের আমলকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মধ্য যুগ' নামে চিহ্নিত করা চলে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে এদেশে আগত ইংরেজ বণিকদের হাতে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ঘটল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বণিক ইংরেজ এদেশের শাসনদণ্ড হাতে তুলে নিল। ইংরেজ শাসন এ দেশে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হল। ইংরেজদের সাহিত্য-সংস্কৃতির যাদুকাঠির ছোঁয়ায় বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর ঘটল। বাংলা সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি একেবারে আমূল বদলে গেল। শুরু হল বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ।

এবারে বাংলা ভাষার উদ্ভব কেমন করে হল, তাই আলোচনা করছি। আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে যারা বাস করত, তারা দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ। এরা দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক ভাষা ব্যবহার করত। ঢেঁকি, কুলা, মোট, মুটিয়া, পান-স্থপারি, হাওড়া, রিষড়া, তমলুক প্রভৃতি প্রচলিত শব্দে ঐ ভাষার নমুনা মেলে। আর্যদের আসার ফলে এ ভাষা লুপ্ত হয়ে যায়। আর্যেরা যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করত, তাকে **প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা** বলা হয়েছে। এই ভাষার দুটি রূপ ছিল। একটি প্রাচীনতর, তা ঋগ্বেদের এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ভাষা—যাকে বলা চলে বৈদিক বা ছান্দস্ ভাষা। আর অপরটি নবীনতর, সেকালের শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের এবং লৌকিক কাব্যকাহিনীর ভাষা। এই শেষোক্ত ভাষার পাণিনি-মার্জিত রূপই আমাদের পরিচিত সংস্কৃত। পাণিনি-মার্জিত এই সংস্কৃত ভাষাই সমগ্র আর্যাবর্তে ছড়িয়ে পড়ে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার বাহন হয়ে দাঁড়ায়। কালক্রমে সংস্কৃত লোকমুখে উচ্চারণের শিথিলতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তিত সংস্কৃতের নাম হয় প্রাকৃত। প্রধানত অঞ্চলভেদে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও অর্ধমাগধী প্রাকৃতের এই চারটি রূপভেদ দেখা দেয়। পরবর্তীকালে প্রাকৃত-উচ্চারণ আরও পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তখন এ ভাষার নাম হয় অপভ্রংশ। যথাক্রমে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও

অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও অর্ধমাগধী অপভ্রংশের উদ্ভব ঘটে। ভারতবর্ষের হিন্দী, সিন্ধী, মারাঠী ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষা এইসব অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছে। প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ পর্যন্ত যে ভাষাগোষ্ঠী সৃষ্ট হয়েছে, তাকে **মধ্যভারতীয় আর্যভাষা** বলা হয় এবং অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে **নব্যভারতীয় আর্যভাষা** বলা হয়। আমাদের বাংলা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ থেকে জাত এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এর জন্মসূচনা। বাংলা ভাষার সঙ্গে মৈথিলী, অসমীয়া, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষাও মাগধী অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভবের বিষয়টি স্পষ্ট করছি—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	বাংলা
দুহিতা	ধীআ	ধীঅ	ঝিঅ
কৃষ্ণ	কণ্‌হ	কাণ্‌হ, কাহ্ন	কাণ্‌হ, কাহ্ন
অষ্টাদশ	অট্‌ঠারহ	অট্‌ঠারহ	আঠারহ
কথয়তি	কথেতি	কহেদি	কহই
কর্কট	কক্কট	কংকড	কংকড়
ভবতি	হোতি	হোই	হোই
গ্রাম	গাম	গাঁও	গাঁও

উপরের তালিকাটির দিকে তাকালেই দেখা যাবে—সংস্কৃত পরিবর্তিত হতে হতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষার রূপ পেয়েছে। উৎপত্তিস্থল থেকে শুরু করে বর্তমান অবস্থায় পৌছতে এই প্রায় হাজার বছরে বাংলা ভাষাকে দুটি স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। সে দুটি স্তরকে বলা হয় আদি-বাংলা (১০ম-১২শ শতাব্দী) ও মধ্য-বাংলা (১৩শ-১৮শ শতাব্দী)। এখন যে স্তর চলছে তা তৃতীয় অর্থাৎ আধুনিক বাংলা। এই তৃতীয় স্তরের শুরু উনিশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। উদাহরণ দিয়ে তিনটি স্তর তুলে ধরছি—

আদি-বাংলা	মধ্য-বাংলা	আধুনিক বাংলা
কাণ্‌হ, কাহ্ন	কান	কানু, কানাই
আঠারহ	আঠার	আঠার, আঠারো
তুম্হে	তুহ্মি	তুমি

নদী যেমন তার উৎস থেকে যাত্রা শুরু করে নানা বাঁক ঘুরে অবিরাম বয়ে চলেছে, তেমনি জন্মলগ্ন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার স্রোতোপ্রবাহ বয়ে চলেছে।

বাংলা ভাষার উদ্ভব নিম্নরূপ দেখানো যেতে পারে—

প্রাচীনভারতীয় আর্য ভাষা

- প্রাচীনতর (বৈদিক বা ছান্দস্)
- নবীনতর (**শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের এবং লৌকিক কাব্যকাহিনীর ভাষা— মার্জিত হয়ে 'সংস্কৃত'**)

↓

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা { প্রাকৃত | অপভ্রংশ

|

নব্যভারতীয় আর্যভাষা { বাংলা

আদি-বাংলা মধ্য-বাংলা আধুনিক বাংলা

বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন এবং যুগবিভাগ

আগে ভাষার জন্ম, পরে সাহিত্য সৃষ্টি। বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল সম্পর্কে পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্তে এলেও বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবকাল সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হতে পারেননি। এ যাবৎ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে নিদর্শন মিলেছে, তা চর্যাপদ। চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বিচার করে পণ্ডিতেরা এটি দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে মনে করেন। সুতরাং দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত চর্যাপদেই বাংলাসাহিতের গোড়াপত্তন হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। চর্যাপদ রচিত হবার আগে বাঙালী কবিপণ্ডিতেরা সংস্কৃতে কাব্যকবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক, শিলালিপি ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া প্রাকৃত এবং অপভ্রংশেও সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। বাংলা ভাষার উদ্ভবের সমকালে কবি জয়দেব সংস্কৃতে তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'গীতগোবিন্দ' লিখেছিলেন। বাংলা ভাষায় চর্যাপদ রচিত হলে পর কালক্রমে সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষায় কাব্য রচনা কমে এল এবং বাংলা ভাষায় কাব্যাদি রচনা স্বমহিমায় আপনার স্থান করে নিল।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারাকে মোটামুটি তিনটি যুগে বিন্যস্ত করা চলে—(১) আদি যুগ (২) মধ্য যুগ ও (৩) আধুনিক যুগ।

পণ্ডিতেরা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বিচার করে মোটামুটিভাবে এই যুগ ভাগ করেছেন।

১. আদি যুগ—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগ প্রসারিত। এ যুগের একমাত্র সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদ। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন নাথগীতিকা, শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদিকে বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ইদানীং কালের গবেষণায় এগুলি অনেক পরবর্তীকালের রচনা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২. মধ্য যুগ—তুর্কী আক্রমণকাল (১২০২।১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগ ব্যাপ্ত। এর মধ্যে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালীর সাহিত্য রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির কাল বলে পরিগণিত হতে পারে। এসময়েই মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সমূহ মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদির অনুবাদ, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনীসাহিত্য, শাক্ত পদাবলী প্রভৃতি রচিত হয়েছে। একালেই স্বনামধন্য বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম দাস প্রমুখ কবিকুলের আবির্ভাব ঘটেছে। যাঁর দিব্যপ্রেরণায় মধ্য যুগের সাহিত্য বিস্ময়কর সৃষ্টিপ্রাচুর্যে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব এই যুগে। শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্রে রেখে অনেকে এই মধ্য যুগকে এভাবে বিন্যস্ত করেন—ক. প্রাক্চৈতন্য যুগ (১৩শ-১৫শ শতাব্দী), খ. চৈতন্যযুগ (১৬শ শতাব্দী), গ. চৈতন্যোত্তর যুগ (১৭শ-১৮শ শতাব্দী)।

৩. আধুনিক যুগ—আধুনিক যুগের সূচনা হল এদেশে ইংরেজশাসনের কাল থেকে অর্থাৎ উনিশ শতাব্দী থেকে। সেই আধুনিক যুগ এখনো চলছে। মধ্য যুগের সাহিত্যে দেবতা ছিল প্রধান, আধুনিক যুগের সাহিত্যে মানুষই হল প্রধান। মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্য হাতে লেখা হত। উনিশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়ে তা মুদ্রিত হতে লাগল। আদি ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রকাশবাহন ছিল পদ্য। আধুনিক যুগে গদ্যের সূচনা হল। বাংলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে দেখা দিল বিপুল বৈচিত্র্য ও ও প্রাচুর্য। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি নানা শাখায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এ যুগে বহু সাহিত্যিক-কবির আবির্ভাব ঘটেছে। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি হলেন কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ।

আদি যুগ
চর্যাপদ ঃ সমাজচিত্র ও সাহিত্যসম্পদ

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি। বাংলা কবিতার আদিরূপ। এর কবিবৃন্দ বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখি। এঁদের কলকূজনে বাঙালীর কাব্যভুবন প্রথম জেগে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা গীতিপ্রাণতা, এতে সেই গীতিপ্রাণতার আদি সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে।

শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নয়, নবীন ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যেরও এটি প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে পারে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের আবিষ্কার করেন। তিনি ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারে তালপাতায় লেখা কতকগুলি পুথির সন্ধান পান এবং সেগুলিকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নাম দিয়ে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে প্রকাশ করেন। এতে মোট চারটি বই ছিল—(১) চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজবজ্রের দোহা, (৩) কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও (৪) ডাকার্ণব। শাস্ত্রী মহাশয় সব কটিকেই বাংলা ভাষায় লেখা ভেবেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকেরা দেখিয়েছেন, শুধু প্রথম পুথি চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ভাষাই বাংলা। অবশ্য তাতে অপভ্রংশের ছাপ ও ছাঁদ কিছু কিছু আছে। আর সে সময় উড়িষ্যা ও আসামের কিছু অংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকায় চর্যাপদে উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার আদলও মেলে। এ গ্রন্থের নামকরণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে। কেউ এ গ্রন্থের টীকাকার মুনিদত্তের দেওয়া নাম 'আশ্চর্যচর্যাচয়' রাখতে চান। কেউ বা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' অশুদ্ধ বলে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নাম রাখার আগ্রহ দেখান। সংক্ষেপে এটিকে 'চর্যাপদ'ও বলা হয়। আসলে, এ গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষ' হওয়াই উচিত। প্রথমত, পদগুলি গান (পদশীর্ষে বিভিন্ন রাগরাগিণীর নাম উল্লেখ তাই প্রমাণ করে) এবং দ্বিতীয়ত, এটি বিভিন্ন কবির রচনার সঙ্কলন একটি কোষগ্রন্থ মাত্র। মূল চর্যাসংগ্রহের গ্রন্থখানির নামও 'চর্যাগীতিকোষ' ছিল জানা যায়। যাই হোক, আমরা সংক্ষিপ্ত 'চর্যাপদ' নামটিই ব্যবহার করছি।

চর্যাপদের পুথি প্রাচীন বাংলা ও নেপালী অক্ষরে লেখা। খুবসম্ভব চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি এটি নকল হয়ে থাকবে। পুথির মধ্যের কয়েকটি পাতা না থাকায় সব পদ পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত পদের সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশটি অর্থাৎ একটি অপূর্ণাঙ্গ পদসহ ৪৬টি পূর্ণপদ। তবে অনুমান, এতে সর্বসমেত একান্নটি পদ ছিল। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী আবিষ্কৃত এই গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যেই এই তথ্য

মেলে। পুথির ভাষা অতি প্রাচীন হওয়ায় এবং পদগুলিও অতি হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় রচিত হওয়ায় এগুলির অর্থ বোঝা দুষ্কর। তবে মুনিদত্ত নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃতে এগুলির টীকা লিখে যাওয়ায় গূঢ়ার্থ মোটামুটি বোধগম্য। চর্যাপদের ভাষাকে শাস্ত্রী মহাশয় 'সন্ধ্যা ভাষা' নামে অভিহিত করেছেন। "সন্ধ্যা ভাষা মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায় খানিক বুঝা যায় না।" একথা ঠিক নয়। দিনরাত্রির মিলনক্ষণ গোধূলি-লগ্নের সঙ্গে সন্ধ্যা (বা সন্ধ্যা) ভাষার কোন সম্পর্ক নেই। যে ভাষার বা যে শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করে (সম্+ধ্যৈ) বুঝতে হয়, অথবা যে ভাষার বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নিহিত (সম্+ধা) তাই সন্ধ্যা (বা সন্ধ্যা) ভাষা। একটি চর্যার ব্যাখ্যার প্রারম্ভে মুনিদত্তের উক্তিতে এই কথারই সমর্থন আছে।

চর্যাপদগুলির রচনাকাল নির্ণয় করা সুকর নয়। ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ পণ্ডিতেরা এগুলির রচনাকাল দশম-দ্বাদশ শতাব্দী নির্ধারণ করেছেন। গ্রন্থটির প্রথম পদকর্তা লুইপাদ (আদিকবি বলে সম্মানিত) দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং দশম শতাব্দী থেকেই এই পদগুলির রচনাকার্য শুরু হয়েছে, এমনটি অনুমান করা চলে। চর্যাপদগুলি মোটামুটি তিনরকম ছন্দে রচিত। তবে অধিকাংশই ষোল মাত্রার চউপই ছন্দে লেখা। বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের আদিম নিদর্শন এতে দুর্লভ নয়।

চব্বিশজন পদকর্তা এই সাধনভজনসংক্রান্ত পদগুলি রচনা করেন। পদগুলির অধিকাংশেই রচয়িতার নাম আছে। যেগুলিতে নেই, সেগুলির নাম রচয়িতার টীকা থেকে মেলে। প্রধান পদকর্তাদের মধ্যে লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ ও শবরপাদের নাম উল্লেখ্য। এঁদের একাধিক পদ এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। তিব্বতীগ্রন্থ থেকে এই পদকর্তাদের অল্পস্বল্প পরিচয় জানা যায়—এঁদের অনেকেই বাংলা, মিথিলা, উড়িষ্যা ও কামরূপের অধিবাসী ছিলেন। কয়েকজন কবি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, ধারণা হয়। বেশীরভাগ পদকর্তা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন এবং বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মাচারকে পদগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অল্প কয়েকজন পদকর্তা অবৌদ্ধ হিন্দু-শৈব-নাথযোগী হতে পারেন। এঁদের কিছু পদে অবৌদ্ধ যোগ-ভাবনার আভাস মেলে। চর্যাপদ-রচয়িতাদের সিদ্ধাচার্য বলা হত, কারণ তাঁরা অধ্যাত্মলোকে প্রবীণতায় একদিকে আচার্যত্ব ও অন্যদিকে পারমিতা লাভের ফলে সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

'চর্যা' শব্দের অর্থ—কৃত্যানুষ্ঠান। চর্যাপদে বৌদ্ধ মহাযান থেকে উদ্ভূত বজ্রযান ও সহজযান মতাবলম্বীদের কৃত্য ধর্মানুষ্ঠানই প্রধানত স্থান পেয়েছে। বজ্রযান ও সহজ-

যানের গূঢ়ধর্ম, সাধনরীতি ও তত্ত্ব-উপদেশ নানা-ধরণের শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক-চিত্রকল্পের দ্বারা আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। বাস্তব মরজীবনের আধিব্যাধি, জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া ও সহজ অবস্থারূপ মহাসুখপ্রাপ্তিই এঁদের কাম্য ছিল। আর সেই প্রার্থিত মহাসুখপ্রাপ্তির পথের সন্ধান পাবার জন্য পদকর্তারা নানাপ্রকার গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণের উল্লেখ করেছেন। এ পথের পথিক যাঁরা হতে চান, তাঁদের জন্য রহস্যময়তার মোড়কে ভরে জানিয়ে গেছেন পথসন্ধানের কথা।

সমাজচিত্র ॥ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা অন্তরের গভীরতায় ধর্মের নিবিড় উপলব্ধিকে পেতে চেয়েছেন। এই অমূর্ত উপলব্ধিকে রূপ দিতে প্রয়োজন হয়েছে নানা রূপকের। কবিরা তা সংগ্রহ করেছেন লোকজীবনের বাস্তব প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতা থেকে। এ কারণে এগুলিতে হাজার বছর আগেকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের জনপদজীবনের এক উজ্জ্বল ছবি ধরা রয়েছে। সেকালের সাধারণ মানুষের জীবন ছিল নিশ্ছিদ্র দারিদ্র্যে ভরা—'হাঁড়িত ভাত নাহি'। তাই কেউ পদ্মের ডাঁটা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। আবার কেউ বা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চুরি-চামারিও করত। এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও অতিথি-অভ্যাগতকে সমাদর জানাত গৃহস্থেরা। সমাজে বর্ণাশ্রমপ্রথা কঠোরভাবে প্রচলিত ছিল। অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ যারা যেমন ডোমেরা, বাস করত নগরের বাইরে। শবরেরা বাস করত উঁচু পাহাড়ে বা টিলাতে। শবরেরা বনেজঙ্গলে হরিণ শিকার করত। ডোমেরা বেতের বা বাঁশের চাঙ্গাড়ি, চুপড়ি, ধামা, কুলা, ধুচুনি তৈরি করে জীবিকানির্বাহ করত। কোন কোন ডোম খেয়ামাঝির কাজ করত। অবশ্য একাজে ডোমনারীরা ছিল সবচেয়ে বেশী দক্ষ। ডোমনারীদের কেউ কেউ নৃত্যবিদ্যায় নিপুণা ছিল—'এক সো পদমা চৌসঠী পাখুড়ী। তাহঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥' যাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল, তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠান খুব আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হত। বাদ্যভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রা করা হত, বাসর ঘরে মেয়েরা বরকে ঘিরে সারারাত হাস্যকৌতুক করত এবং আমোদ-আহ্লাদ উপভোগ করত। বিয়ের পর নববধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে স্বামীগৃহে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল।

কার্পাসের চাষ ছিল। বস্ত্র ও মাদুর বোনা হত। কাঠ কেটে নৌকা বানানো হত। পল্লী অঞ্চলে ছোট নদী অথবা খাল পারাপারের জন্য সেতু ছিল। জলপথে নৌকার সাহায্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করা হত। নৌকায় পার হবার জন্য কড়ি লাগত। স্থলপথে অথবা জলপথে দস্যু আক্রমণের ভয় ছিল। নানাস্থানে শুল্ক-সংগ্রহকারীদের উপদ্রব ছিল এবং শান্তিরক্ষকদের অত্যাচার-উৎপীড়ন ছিল।

গৃহস্থের ঘরে চাষের বলদ ও দুধের গাই থাকত। চুরি ডাকাতি নিবারণ করার জন্য ঘরে চাবিতালা দেওয়া হত। হাঁড়ি, পিটা, ঘড়া, গাড়ু—এসব বাসনকোসন ব্যবহৃত হত। ধার্মিক লোক আগম পুথি পড়ত, কোশাকুশি নিয়ে পূজা করত এবং মালা জপত। এক শ্রেণীর গায়ক-গায়িকা একতারা ('হেরুঅবীণা') বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়াত। নাট্যানুষ্ঠানও হত—'বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই'। সাধারণের মধ্যে আয়নার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং স্ত্রীলোকেরা কাঁকন, মুক্তাহার, কুণ্ডল ইত্যাদি অলঙ্কার পরিধান করত। ধনীদের গৃহে সোনা রূপার প্রাচুর্য ছিল। দাবা খেলার চল ছিল—'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নববল।' ধনীদের একটি বিলাস ছিল খাটের উপর পাতা বিছানায় শুয়ে কর্পূর মেশানো পান খাওয়া। মদ্যপানের রেওয়াজ ছিল। মদবিক্রীর স্থানটিকে চিহ্নিত করে রাখা হত এবং ক্রেতারা তাতে নিঃশব্দে ঢুকে মদ্যপান করত—'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ। আইল গরাহক অপণে বহিয়া॥' সেকালের অখ্যাত অজ্ঞাত অতিসাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখেদুঃখে, হাসিকান্নায়, আশানিরাশায় করুণ মধুর জীবনের চিত্র এতে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে—তাই জীবনরসিক ঐতিহাসিকের কাছে এগুলির মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন বাংলাদেশের ভাষা, সমাজ, ধর্মভাবনা এবং অধ্যাত্মচিন্তার দৃষ্টান্ত হিসেবে চর্যাপদগুলি অমূল্য সম্পদ। এগুলি আবিষ্কৃত না হলে আদি যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় তথা সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য আমাদের কাছে চির-অজ্ঞাতই রয়ে যেত।

সাহিত্যসম্পদ॥ চর্যাপদগুলির অবলম্বিত বিষয় মোটেই সাহিত্যোচিত রসবস্তু নয়, বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্ব এগুলির উপজীব্য। তবুও ঘনান্ধকার আকাশে হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুৎ-আভার মত কোন কোন পদে সাহিত্যরসের ক্ষণিক সঞ্চার ঘটেছে। চর্যাপদে কবিদের ছন্দ, শব্দযোজনা এবং অলঙ্কার ব্যবহার প্রশংসনীয়। শ্লেষ, অনুপ্রাস, উপমারূপক ইত্যাদি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ চর্যাপদে শিল্পসমুজ্জ্বল রূপ পেয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রথাগত বর্ণনা এঁরা অনুসরণ করেননি। হৃদয়-উৎসারিত অনুভূতি প্রকাশ করতে নতুন নতুন চিত্রকল্পনা ও রূপরচনা করেছেন। জ্ঞানকে জ্যোৎস্না, কায়াকে নৌকা, বিশেষত করুণাকে ডমরুধ্বনি কল্পনা করা চর্যাপদকারদের মৌলিক কল্পনাশক্তির প্রকাশক। এ সকল চিত্রকল্পনায় বর্ণনীয় বস্তুতে লাবণ্য ও সৌন্দর্য ব্যঞ্জিত করে চর্যাপদকারেরা অনন্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যখন চারদিক বেড়ে হাঁক পড়ে, শিকারীর দল হরিণকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তখন হরিণ আশ্রয় খুঁজে পায় না। দিশেহারা হরিণকে হরিণী এসে পথ দেখালে হরিণ শিকারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে দ্রুত পালাতে থাকে—'তরঙ্গেতে হরিণার খুর ন দীসঅ'। দ্রুত-ধাবমান হরিণের আত্মত্রাণের জন্য উদ্দাম পলায়নের চিত্ররূপটি আমাদের মনকে সহজে

মুগ্ধ করে। চর্যাপদকারেরা কবিদৃষ্টি দিয়ে এই জগৎকে দেখেছেন—তাই বাংলাদেশের গাছপালা, নদনদী, জনপদপ্রান্তর, শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনী, খরনদীর ক্ষুরধারস্রোত, পত্রপুষ্পশোভিত বাসন্তীপ্রকৃতি, আঙ্গিনায় ফোটা সাদা কাপাসফুল সব কিছুই সুন্দর মোহনীয় হয়ে এঁদের পদগানে ধরা পড়েছে। শবরপাদের নিম্নোদ্ধৃত পদে কাব্যসৌন্দর্য তত্ত্ববোধের দুর্ভেদ্য বেড়া ভেদ করে আপন লাবণ্য প্রকাশ করেছে—

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তৌহোরি
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥

এর আধুনিক বাংলায় অনুবাদ এরকম—উঁচু উঁচু পর্বত, তথায় বাস করে শবরীবালা, ময়ূরপুচ্ছপরিহিত শবরী, গ্রীবায় গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করো না, তোমার দোহাই। এ তোমার ঘরণী, নামে সহজসুন্দরী।

মহাসুখচক্রে বজ্রধর শবরের সহজগৃহিণী নৈরাত্মা দেবী বাস করেন—উদ্ধৃত পদনিহিত এই সুসূক্ষ্ম তত্ত্বকথাকে ছাপিয়ে উন্মুক্ত নীল আকাশের তলে শবর-শবরীর মোহময় মিলনাবেশ এক রোমান্টিক সৌন্দর্যব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়েছে। মহাসুখলাভের বাসনা কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে প্রিয়সঙ্গকামনায় রাগরক্তিম হয়ে উঠেছে।

ভুসুকুপাদের একটি গানে নির্দয় দস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত ও সর্বস্বান্ত মানুষের রিক্ততার অনুভূতি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে—

অদয় বঙ্গালে দেশ লুড়িউ।...
নিঅ ঘরণী চণ্ডালে নেলী॥

এই গানের তত্ত্বার্থ যাই হোক, এতে যে বেদনাকারুণ্যের স্পর্শ লেগেছে, তাতে গীতিকবিতার স্বাদমাধুর্য রসিক-চিত্তে অনায়াসে সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে। ধর্মকেন্দ্রিক রচনা হয়েও চর্যাপদগুলি সাহিত্যসম্পদে হয়ে উঠছে অপূর্ব সমৃদ্ধ। বস্তুতঃ চর্যাপদ তত্ত্বের মৃণালে কাব্যের শতদল।

মধ্য যুগ

তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি—সামাজিক অবস্থা

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ ঘটে। ১২০২ বা ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী নামে এক তুর্কী সেনানায়ক বাংলার তৎকালীন রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। বখ্‌তিয়ার খিলজীর অতর্কিত আক্রমণে বৃদ্ধ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড়বঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। ফলে হিন্দুরাজশক্তির অবসান ঘটে এবং মুসলমান শাসনের সূচনা হয়।

তুর্কীদের হাতে লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের মূলে ছিল তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতি। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বে বাংলার রাষ্ট্রীয় সংগঠনে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। সুন্দরবন, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের অধিকর্তারা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিল। ফলে কেন্দ্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সমাজজীবনেও ভাঙন শুরু হয়েছিল। কঠোর ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের ফলে বর্ণভেদ তীব্রতর হয়েছিল, ফলে উচ্চতর ও নিম্নবর্ণের ঐক্যবোধ বিলুপ্ত হয়েছিল। অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, তুকতাক ও জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদিতে বিশ্বাস বাঙালীকে নির্বীর্য, উদ্যমহীন ও শিথিলচরিত্র করে তুলেছিল। এইরকম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দুর্বলতার সুযোগে বখ্‌তিয়ার খিলজী সহজেই বাংলাদেশ অধিকার করতে সমর্থ হন। প্রখ্যাত ইতিহাসকার ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধেয়—"বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির পরিণাম।'

প্রায় বিনাযুদ্ধে জয়ী তুর্কীদের বিজয়োল্লাস বাংলাদেশের বুকে সর্বত্র এক তাণ্ডবের বন্যা বইয়ে দিল। তুর্কীরা শুধু দেশ জয় করেই সন্তুষ্ট হল না, তারা এদেশের অধিবাসীদের ধর্ম এবং সমাজজীবনেও গুরুতর আঘাত হানল। অমুসলমান কাফেরদের ধ্বংসসাধন এবং তাদের মন্দির, মঠ-বিহার, দেববিগ্রহ, ধর্মগ্রন্থ বিনষ্ট করাকে পুণ্যকর্ম বলে মুসলমানেরা মনে করতে থাকল। ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য পীর-ফকিরেরা সক্রিয় হয়ে উঠল। মুণ্ডিত মুস্তক বৌদ্ধদের জোর করে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা হতে থাকল। বৌদ্ধমঠ বিহারাদি ধ্বংস করা হতে লাগল। পুথিপত্র নিয়ে অনেকে নেপালতিব্বতে পালিয়ে যেতে লাগল। হিন্দুদের বহুক্ষেত্রে বলপূর্বক জাতিচ্যুত করা হতে লাগল। মন্দির ও দেববিগ্রহকে ভগ্ন, বিধ্বস্ত করা হতে লাগল। তুর্কীসৈন্য গ্রামের কৃষিপণ্য জবর দখল করে, শ্রমিকদের বেগার খাটিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তুলল। এ সময়ের ইতিহাস দেশময় লুণ্ঠন ও ধর্মান্তরিতকরণের ইতিহাস। রাজশক্তির বারংবার উত্থান-পতনের ফলে দেশময় অরাজকতা ও অশান্তি পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। গৌড়বঙ্গ

বিজেতা সুলতানদের আমলে গৃহবিবাদ, ষড়যন্ত্র, পদচ্যুতি, হত্যা এসব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিকেরা এই সময়ের বাংলাদেশকে বলেছেন 'বালঘাকপুর' অর্থাৎ বিবাদপুরী। এ সময়ে বিপ্লব, রক্তপাত ও হিংসা প্রধান হয়ে উঠেছে, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়েছে। ধর্ম ও জীবন যেখানে বিপন্ন, সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনের অবকাশ থাকে না। আনেকটা একারণেই সম্ভবত তুর্কীবিজয়ের পর এই দুই শতাব্দীতে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি কিংবা এমনও হতে পারে সাহিত্য রচিত হলেও তা বিনষ্ট হয়ে গেছে ফলে কোন সাহিত্যকৃতির নিদর্শন মেলেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী এক নিবিড় তমিস্রার যুগ।

তুর্কীবিজয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে অন্ধকার নেমে এলেও বাংলার সামাজিক স্তরে এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুফলগুলি দেখা দিয়েছিল—

১. সেকালে বাঙালীসমাজের মধ্যে বড় রকমের শ্রেণীবিভাগ ছিল। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী যারা অভিজাতসমাজের ছিল, তারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন এবং অন্যান্য বিদ্যাচর্চায় রত থাকত, সমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না। অপরদিকে শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ইত্যাদি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের সময় নির্বাহ হত কৃষিকাজ ও অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমের কাজে। এদের আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ, সংস্কৃতির সঙ্গে অভিজাত শ্রেণীর আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ বা সংস্কৃতির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। ফলে হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বিভেদনীতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তুর্কীবিজয়ের ফলে বিজয়ী রাজশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে আর্য-অনার্য, উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু পারস্পরিক বিভেদ ভুলে গিয়ে এক সমন্বিত বাঙালী জাতি গড়ে তুলেছিল। ডঃ সুকুমার সেন চমৎকারভাবে সে-কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন—"আর্য অনার্যের মধ্যে সংস্কৃতিগত ধর্মবিশ্বাসগত আচারব্যবহারগত ও ভাবধারাগত এই যে স্তরভেদ ইহা বিলুপ্ত হইয়া অখণ্ড বাঙালীজাতি গঠিত হইয়া উঠিবার পক্ষে একটি প্রধান বস্তুর অভাব ছিল, দ্বিতীয় পক্ষের সংঘাত। যেমন দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু অক্সিজেন মিলিত হইয়া জলকণা হইতে গেলে প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তির অপেক্ষা রাখে, তেমনি দুই জাতি বা ভাবধারা মিলিয়া একটি অখণ্ড জাতি বা ভাবধারায় পরিণত হইতে গেলে প্রচণ্ড বাহ্য বা আভ্যন্তর সংঘাত ও শক্তির প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালাদেশ আর্য-অনার্য দুই স্তরের পরস্পর মিলনকল্পে তুর্কীঅভিযানরূপ প্রচণ্ড সংঘর্ষের অপেক্ষা করিতেছিল।...... মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য ও অনার্যের মিলন হইয়া বাঙালী জাতি বিশিষ্টরূপ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল।"

২. তুর্কীবিজয়ের আগে বাঙালী কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করছিল। বাংলার কৃষিজ, শিল্পজাত সম্পদ দ্রব্যের কেনাবেচা বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তুর্কীবিজয়ের পরে ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে যোগসূত্রে বাংলার কৃষিজ, শিল্পজাত সম্পদ বাংলার বাইরে বিক্রীত হয়ে অর্থনীতিতে নতুন দিকের সূচনা করল। এছাড়া, গ্রামনির্ভর বাঙালীসমাজে নগরের সূত্রপাত ঘটল। রাজ্যশাসনকে কেন্দ্র করে ব্যবসার কেন্দ্ররূপে বর্ধিষ্ণু গ্রাম গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, তাণ্ডা, দেবকোট, পাণ্ডুয়া ইত্যাদি নগরে পরিণত হল।

৩. তুর্কীবিজয়ের ফলে বাঙালীসমাজ নবভাবে গঠিত হল। শাসককুলের দ্বারা আমন্ত্রিত পীর, ফকির ইত্যাদি সম্প্রদায় এবং ধর্মান্তরিত হিন্দু অর্থাৎ নব মুসলমানেরা মিলেমিশে বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই প্রধান সম্প্রদায় গড়ে তুলল। মুসলমানেরা বাংলাদেশের সমাজে মাটিতে জন্মে মরে এই সমাজ-মাটির অঙ্গীভূত হয়ে উঠল। তুর্কী-আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলমানের উভয়ের মধ্যেকার যে অপ্রীতি ছিল তা দূর হয়ে এল। মুসলমানের সত্যপীর হয়ে উঠল হিন্দুর সত্যনারায়ন। ওলাইচণ্ডী, ওলাই-বিবি প্রভৃতি হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত ধর্মজীবনের ঐক্যসূত্রের ধারক হয়ে প্রতিষ্ঠা পেল।

৪. তুর্কীবিজয়ের ফলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি নতুন পথ ধরে সমৃদ্ধির দিকে এগোবার সুযোগ পেল। তুর্কীআক্রমণে আর্যব্রাহ্মণ্য জীবন ও অনার্যলৌকিকজীবন সমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই বিপদের দিনে উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে তারা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে চাইল। বিপর্যস্ত উভয়ের মধ্যে চলতে লাগল সংস্কৃতির আদানপ্রদান। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের পূজিত দেবদেবীকে স্বীকৃতি জানাল। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দুর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার সুযোগ পেল। এভাবেই বহু আর্যেতর দেবতা চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি আর্যদেবদেবীর পাশে স্থান করে নিল এবং কালক্রমে এরা আর্যদেবমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। আদিতে চণ্ডী ছিলেন অনার্যব্যাধজাতির উপাস্য কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি শিবজায়া উমার সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। সাপের দেবী ভয়ঙ্করী মনসা শিবের কন্যা বলে প্রচারিত হল। আর্যদেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে একীভূত হয়ে উঠল অনার্যদেবতা ধর্মঠাকুর। লোকসেবিত ও স্ত্রীসেবিত লৌকিক দেবদেবী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে সম্মানের আসন পেল। ফলে এই দেবদেবীর সংশ্লিষ্ট মঙ্গলকথাও আর অপাংক্তেয় থাকল না। ব্রতকথা-ছড়া-পাঁচালী-রূপে যে মঙ্গলকথা বা মঙ্গলগান অপরিণত আকারে ছিল, তা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে মঙ্গলকাব্যের পরিণত শিল্পরূপ পেয়ে অনন্যসুন্দর দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠল। সুবিপুল মঙ্গল-কাব্যসাহিত্যের উদ্ভবের মূলে তুর্কীবিজয়ের ফল কাজ করেছে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৫. চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ইলিয়াসশাহী রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। তুর্কী-আক্রমণের অব্যবহিত পরে সারাদেশ জুড়ে যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইলিয়াসশাহী সুলতানদের আমলে ধীরে ধীরে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃঙ্খলা দূর হওয়ায় সাহিত্যরচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এদিকে মুসলমানবিজেতারা বাঙালী হয়ে উঠলেন, আর বিদেশীয় থাকলেন না। তাঁরা হিন্দু-কাব্যশাস্ত্রাদির রসাস্বাদনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কোন কোন সুলতান সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারত, ভাগবতাদি ভাষায় অনুবাদ করে শোনানোর জন্য সংস্কৃতজানা পণ্ডিত-দের নির্দেশ দিলেন। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা নতুন উদ্যমে শুরু হল এবং অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভব হল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—"মুসলমান, ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, মহরম, ঈদ, সবেরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল, রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদের ধর্ম, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল। গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। রুকনুদ্দিন বারবক শাহের উৎসাহে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত অনুবাদের মূলে ছিলেন যথাক্রমে পরাগল খাঁ ও ছুটি খান।

পঞ্চদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইলিয়াসশাহী বংশ নানা দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এরপর কয়েক বৎসর বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করে হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন ও সম্রাট হন (১৪৯৩-৯৪খ্রীষ্টাব্দ)। হিন্দু কবিরা তাঁকে বলেছেন 'নৃপতিতিলক', 'জগতভূষণ'। হোসেন শাহ বীরপুরুষ ছিলেন। বহু রাজ্যে অভিযান করে সেই সমস্ত অঞ্চলে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। তাঁর শাসনকালেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর দুই প্রধান হিন্দু রাজকর্মচারী সনাতন ও রূপ শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর সময় থেকেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে শ্রী ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কাব্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই সময়ে লেখা হয়ে থাকবে, অনুমান।

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আবিষ্কার ও নামকরণ॥ বড়ু চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের আদিকবি বাল্মীকি। তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খাঁটি বাংলা ভাষায় বাঙালী-রচিত প্রথম কাব্য। মধ্য যুগের বাংলা ভাষার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন এতেই মেলে। এ কারণে যাঁরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁদের কাছে এ গ্রন্থের বিশেষ মূল্য রয়েছে। তাছাড়া, শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত পরবর্তী রাধাকৃষ্ণের লীলার ধারা থেকে এ কাব্য সম্পূর্ণ পৃথক এবং কামনাবাসনাতুর মানবমানবীর প্রণয়-কাহিনীরূপে এ কাব্যের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়।

১৩১৬ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে এই ঐতিহাসিক পুথিটি আবিষ্কার করেন। রায় মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত পুথিটি তুলোট কাগজে লেখা, দু-তিন রকমের হস্তাক্ষর এতে আছে। পুথিটি আদিতে, মধ্যে কিছু কিছু স্থানে এবং শেষের দিকে খণ্ডিত। সাধারণত, বাংলা পুথির শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থনাম, গ্রন্থকারের নাম এবং গ্রন্থরচনার ও পুথিনকলের কালের নির্দেশ থাকে। একে পুষ্পিকা বলে। এই পুষ্পিকা না থাকায় গ্রন্থনাম, গ্রন্থকর্তার নির্ভরযোগ্য পরিচয় এবং গ্রন্থরচনার কালের কোন সন্ধান মেলেনি। এতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত দেখে সম্পাদক মহাশয় নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। কেউ কেউ বর্তমানে এটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' রাখতে চান। কারণ হিসেবে পুথির মধ্যে প্রাপ্ত একটি ছোট রসিদের উল্লেখ করে থাকেন। এই রসিদে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামক একটি গ্রন্থের ষোল-খানি পাতার লেনদেনের বিবরণ আছে। রসিদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির মধ্যে পাওয়া যাওয়াতে ঐ উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেই বোঝাচ্ছে, এমনটি তাঁরা মনে করেন। কিন্তু এই যুক্তি খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনও হতে পারে, বিষ্ণুপুরের রাজশালায় সংগৃহীত শ্রীজীব গোস্বামী রচিত 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামক পুথির পাতা ধার দেওয়া সম্পর্কিত রসিদটি এতে গুঁজে রাখা হয়েছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটিই (প্রকৃত নাম যথার্থ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত) গ্রহণ করা আপাতত সমীচীন।

কবি-পরিচয়॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির নাম কবিতার ভণিতা থেকেই জানা যায়। 'ভণিতা' কবিতার শেষ ছত্রে কবির নাম-স্বাক্ষর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তিন রকমের ভণিতা আছে। (১) বড়ু চণ্ডীদাস, (২) চণ্ডীদাস ও (৩) অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাই বহুল ব্যবহৃত—তাই মনে হয় কবির নাম ছিল—বড়ু চণ্ডীদাস। প্রায় সব ভণিতার সঙ্গেই দেবী বাসলীর নাম আছে, এতে মনে হয়, কবি বাসলী-সেবক ছিলেন।

বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রাম, কারো কারো মতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রাম বড়ুর আবাসভূমি ছিল। খুবসম্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি আবির্ভূত

হয়েছিলেন। এ তথ্য নিতান্ত আনুমানিক। অন্ধকার অতীত থেকে আজ আর কবির জন্মস্থান ও জন্মকাল সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

গ্রন্থ-রচনাকাল॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির তুলোট কাগজ, হাতের লেখা, ভাষা ও ভাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই (শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকাল ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) এটি রচিত বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কাহিনী-পরিচয়॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—কংসাসুরের অত্যাচারে পীড়িত পৃথিবীর ভারমোচনের জন্য দেবতাদের অনুরোধে ভগবান নারায়ণ কৃষ্ণরূপে জন্মালেন এবং কৃষ্ণের সেবার জন্য লক্ষ্মী রাধারূপে জন্ম নিলেন। মর্ত্য জন্মে রাধা নিজে যে লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণ যে তাঁর স্বামী বিষ্ণু একথা ভুলে গেল। দৈব-নির্দেশে নপুংসক আইহনের সঙ্গে বিয়ে হল রাধার।

একদিন গোচারণরত কৃষ্ণ রাধার উন্মেষিত যৌবন দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে পেতে অভিলাষী হল। বড়াইকে দূতী করে রাধার কাছে 'ফুল-তাম্বুল' পাঠিয়ে প্রেম নিবেদন করল কৃষ্ণ। রাধা ঘৃণাভরে কৃষ্ণের প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করল। ব্যর্থ হল বড়াইয়ের দৌত্য।

বিফলমনোরথ কৃষ্ণ তখন শুল্ক আদায়কারীর ছদ্মবেশে মথুরার হাটে গমনোদ্যত রাধার কাছে শুল্ক দাবী করল। তা দিতে না পারায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাধা কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এরপর একদিন রাধা নদী পারের জন্য কৃষ্ণের নৌকায় উঠলে মাঝ নদীতে নৌকা টলিয়ে রাধাকে ভয় দেখিয়ে আপন অভিলাষ পূর্ণ করল কৃষ্ণ। রাধার কৃষ্ণবিমুখতা এখন মন্দীভূত। দধির পসরা বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ভারী বেশধারী কৃষ্ণের সঙ্গে, মথুরার তপ্ত পথে রাধার মাথায় ছত্রধারণকারী কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা পথ চলে। এরপর বৃন্দাবনে পুষ্পকুঞ্জে রাধার সঙ্গে মিলন ঘটল কৃষ্ণের। স্নানরতা রাধা ও সখীদের বস্ত্র ও হার কৃষ্ণ চুরি করলে যশোদার কাছে নালিশ জানাল রাধা। এতে রাধার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ রাধাকে মারণ-বাণে বিদ্ধ করল। বাণের আঘাতে মূর্ছিত হল রাধা। বড়াই স্ত্রী হত্যার দায়ে কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করলে তখন রাধাকে বাঁচিয়ে তুলল কৃষ্ণ।

এই ঘটনার পর কিছুদিন ধরে রাধা কৃষ্ণের প্রতি উদাসীনতা দেখাতে লাগল। কৃষ্ণ তখন একটা সুন্দর বাঁশী তৈরি করে বাজাতে লাগল। বাঁশীর সুরে ব্যাকুলা রাধা বড়াইয়ের পরামর্শে ঘুমন্ত কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করল। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের কাতর অনুনয়ে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী দিল ফিরিয়ে। রাধা এখন কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা কিন্তু কৃষ্ণ রাধার প্রতি উদাসীন। যাই হোক, বড়াইয়ের চেষ্টায় প্রেমিকযুগল পুনরায় হল মিলিত। মিলনশেষে রাধা কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে নিদ্রিতা

রাধাকে রেখে 'গতকৃষ্ণ' কৃষ্ণ পালিয়ে গেল। জেগে উঠে কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে রাধা আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল—'কেমতেঁ পাও এবেঁ শ্রীমধুসূদন'। কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার অনুরোধে বড়াই কৃষ্ণের সন্ধানে রত হয়ে মথুরাতে তার সাক্ষাৎ পেল। রাধার বিরহবেদনা জানিয়ে বৃন্দাবনে ফেরার জন্য কৃষ্ণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল কিন্তু কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরল না। এখানেই কাহিনীর সূত্র বিচ্ছিন্ন, কারণ পুঁথির পাতা আর নেই।

কাব্যটি কিভাবে সমাপ্ত হয়েছিল জানা যাচ্ছে না। কারো কারো ধারণা, মিলনেই কাহিনী শেষ হয়েছিল। এদের এই ধারণার কারণ ভারতীয় সাহিত্যে বিয়োগান্তক কাব্যরচনার রেওয়াজ নেই। কিন্তু প্রতিভাধর কবি বড়ুর ক্ষেত্রে পুরাতন রেওয়াজ ভেঙ্গে বিরহের মধ্যে কাব্য শেষ করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

কাব্যকথা॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য। ভূভারহরণের জন্য গোলোকের বিষ্ণুর মর্ত্যে কৃষ্ণরূপে এবং লক্ষ্মীর রাধারূপে জন্মগ্রহণ এবং তাদের মিলনলীলার কথাই এই কাব্যের প্রধান কাহিনী। এর কাহিনীবস্তু জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ—এই তেরটি অংশে বিভক্ত।

কাহিনীবস্তু থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী এখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা পুরাণ ও বৈষ্ণবশাস্ত্রাদি বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী থেকে অনেকাংশে পৃথক। সংস্কৃত পুরাণাদিতে বড়ু চণ্ডীদাসের যে গভীর জ্ঞান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণনায় ও রাসলীলা, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি বর্ণনায় বড়ু চণ্ডীদাস বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণাদির অনুসরণ করেছেন। তবে পুরাণের অনুসরণ এই দুটি-একটি মাত্র ঘটনায় আর বাদ-বাকী অংশে তিনি পুরাণবহির্ভূত ঘটনারই আশ্রয় নিয়েছেন, দেখা যায়। কবি সম্ভবত গ্রামীণ সমাজে প্রচল কোন লৌকিক রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়কাহিনীর উপর নির্ভর করে থাকবেন কিংবা হয়তো এ কাহিনীতে তাঁর নিজস্ব কবিকল্পনা অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পুরাণকেন্দ্রিক আখ্যানকাব্য হিসেবে যাঁরা নিতে চান তাঁদের সমর্থন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, পুরাণ ও অপুরাণ কাব্যধারা এ দুয়ের সংমিশ্রণেই এ কাব্যের কায়াপ্রতিমা গড়ে উঠেছে। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের গীতগোবিন্দের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের অনেকগুলি পদ জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুবাদ মাত্র। বহু ক্ষেত্রে গীত-গোবিন্দের ভাব ও ভাষার অনুসরণ করেছেন। শুধু ভাব-ভাষার ক্ষেত্রে নয়, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কাব্যাঙ্গিকে গীতগোবিন্দের নাট-গীতের কাঠামো প্রত্যক্ষভাবে অনুসৃত হয়েছে। গীতগোবিন্দের সংস্কৃত শ্লোকগুলির মত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও সন্নিবিষ্ট সংস্কৃত

শ্লোকগুলি (খুবসম্ভব কবি-রচিত) কাহিনীর সূত্র রক্ষা করেছে। কাহিনীর এবংবিধ নাটকোচিত গ্রন্থনে সত্যই দক্ষতার পরিচয় মেলে। বড়ু চণ্ডীদাস অমার্জিত, স্থূল ও গ্রামীণ রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়কাহিনীর মধ্যে যে কবিত্বশক্তি ও জীবনঅভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর।

প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর কবিত্বের চিহ্ন অতি স্পষ্ট। মাঝ যমুনার পর্বতসমান ঢেউ। বৃন্দাবনের কুসুমিত লতাকুঞ্জ, মধুমত্ত মধুকরনিকরের মধুর ঝঙ্কার, মেঘেঢাকা অন্ধকার রাত্রি—'মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশি' প্রকৃতির বর্ণনা সুন্দর। জ্যৈষ্ঠের অবসানে আষাঢ়ের আগমনে শ্যামল নববর্ষের এই সূচনা—'জেঠ মাস গেল আষাঢ় পরবেশ। সঘন মেঘে ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ।'

কাব্যশরীরের প্রসাধনে কবির উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ নিপুণ ও রসোজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দোবৈচিত্র্যেও কবির কারুদক্ষতার পরিচয় মেলে। নবজাত বাংলা ভাষা এই কবির হাতে যে কিরূপ সাবলীল ও শক্তিমান হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় কাব্যের প্রতি ছত্রেই সুস্পষ্ট। শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি যখন বলেন—

তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী॥

—তখন এর ভাব এবং ভাষার ব্যঞ্জনায় রাধার যে রূপসৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তা প্রকৃতই উজ্জ্বল রক্তিম কনকলাবণ্যে আমাদের মুগ্ধ করে। বড়ু কবির হাতে বাংলা ভাষা ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে কতটা শক্তি আয়ত্ত করেছে, তা এ থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়।

দয়িত কৃষ্ণের বাঁশী শুনে যন্ত্রণাদীর্ণ হৃদয়ে রাধা যখন করুণ বিলাপ করে বলে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥···
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥

—তখন অভিভূত না হয়ে উপায় থাকে না। প্রেমিকা রাধার অশ্রু-শিশিরে ভেজা মূর্তিটি আমাদের হৃদয়ের পরতে চিরতরে আঁকা হয়ে যায়।

প্রণয়ভঙ্গজনিত বেদনায় রাধা যখন তীব্র আর্তিতে হাহাকার করে বলে—

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে।

হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁা বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥

—তখন রাধার বেদনার্তি কবির হৃদয়রক্তরাগের ছোঁয়ায় তীক্ষ্ণতর হয়ে আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে।

বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত কবিক্ষমতার পরিচয় এ কাব্যের পাত্র-পাত্রীর চরিত্রচিত্রণে। চরিত্রগুলিতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। কৃষ্ণ প্রথমে রাধার প্রতি আকৃষ্ট, পরে বিমুখ; রাধা প্রথমে কৃষ্ণ-বিমুখী কিন্তু শেষে কৃষ্ণগতপ্রাণা। পাত্র-পাত্রী প্রধানত তিনজন—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। এই তিনটি চরিত্রই কবির হাতে উজ্জ্বলতা পেয়েছে। তবে রাধার চরিত্রচিত্রণেই তাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। বড়ুর আঁকা কৃষ্ণের প্রতি অনেকেই বিরূপ। কৃষ্ণচরিত্রে গ্রাম্যতা আছে, পৌরাণিক মহিমা একটুও নেই, একথা সত্যি। তবুও দেহে-মনে স্বাস্থ্যবান গোয়ালা-পাড়ার একটি দুর্ললিত কিশোররূপে চরিত্রটি যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তা অনস্বীকার্য। বড়াই কুট্টনী ধরণের ধরাবাঁধা চরিত্র হলেও তার মানবিকতাটুকু নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। রাধাচরিত্রেই কবির অসাধারণ চরিত্রাঙ্কন-দক্ষতার পরিচয় আছে। বড়ুর রাধা পদাবলীর অশরীরী মহাভাবস্বরূপা রাধাঠাকুরাণী নয়, এ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখা কলহমুখরা একটি গ্রাম্যা কিশোরী 'চন্দ্রাবলী রাহী'। এই 'চন্দ্রাবলী রাহী'কেই বড়ু চণ্ডীদাস দরদী-শিল্পীমনের প্রীতি-সুধারসসিঞ্চনে 'রাই-কমলিনী' করে তুলেছেন। একেবারে সূচনা থেকে প্রতিক্ষণে, প্রতি খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে রাধার জীবনকে তিলে তিলে বিকশিত করে তুলেছেন একটি পূর্ণস্ফুট পদ্মকোরকের মত। তাম্বুলখণ্ডের কৃষ্ণবিমুখী রাধার হৃদয় যেভাবে ধীরে ধীরে প্রেমে উন্মেষিত করে কৃষ্ণমুখী করে তুলেছেন, তাতেই তাঁর অতুলন কবিশক্তির পরিচয় আছে। বড়ু চণ্ডীদাস এখানে যথার্থই দাবী করতে পারেন—'আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা তুমি আমারি, তুমি আমারি।'

পদাবলী সাহিত্যে যে প্রেমঘন রাধা-মূর্তিকে দেখি, নিঃসন্দেহে বড়ু চণ্ডীদাসের কবিবিধাতাই তার আদি নির্মাতা। কাহিনী-বয়নের চমৎকারিতায়, ভাষারীতি ও অলঙ্কারের উজ্জ্বল কারুকর্মে, চরিত্র-রূপায়ণের মনস্তাত্ত্বিক বিচক্ষণতায় ও কবির জীবন-রসরসিকতায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি অনন্য সৃষ্টি।

অশ্লীলতা ॥ কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি অশ্লীল বলে অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতই কাব্যটি তা নয়। রুচি ও নীতির মানদণ্ড সব দেশে, সব কালে এক নয়। দেশকালভেদে তার বিভিন্ন রূপ। আজকের পাশ্চাত্ত্যরুচিমার্জিত দৃষ্টিতে একে অশ্লীল ও গ্রাম্যতাদুষ্ট মনে হলেও তখনকার সাহিত্যাদর্শ ও সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে বিচার করলে এটিকে অশ্লীল বলা যাবে না।

বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলী

কবি বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। বাংলা-কাব্যভুবন তাঁর কবিপ্রতিভার আলোকে আলোকিত হলেও কবি কিন্তু বাঙালী নন। বাংলার প্রত্যন্ত-প্রদেশ মিথিলা তাঁর জন্মস্থান, মাতৃভাষা মৈথিলী। মিথিলায় তিনি 'মৈথিল কোকিল' নামে পরিচিত। মিথিলায় যাঁর জন্ম এবং মৈথিলী ভাষায় যিনি কাব্যসাধনা করেছেন, তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বলা চলে যে, এর কারণ অনেক। প্রথমত, তৎকালীন মিথিলা ও বাংলার মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ঐক্য বর্তমান ছিল এবং মিথিলা ও বাংলা উভয় স্থান সংস্কৃত-চর্চার পীঠস্থান ছিল। সেজন্য মিথিলার ছাত্র বাংলায় এবং বাংলার ছাত্র মিথিলায় আসাযাওয়া করত। তার ফলে উভয় দেশের মধ্যে একটা আত্মিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, শ্রীচৈতন্যদেব নিত্য তাঁর পদ গান করে আস্বাদন করতেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

চৈতন্য কর্তৃক আস্বাদিত হয়েই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে সমাদর ও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করে। তৃতীয়ত, বাংলার বৈষ্ণব কবিরা, বিশেষ করে গোবিন্দদাস তাঁর পদগান অনুকরণ ও অনুসরণ করে পদরচনা করেছেন আর এ একারণেই গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। চতুর্থত, বাংলার বৈষ্ণব মহাজনেরা পরম নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে তাঁকে আপনাদের করে নিয়েছেন এবং পদসঙ্কলন গ্রন্থে তাঁর কবিতাকে স্থান দিয়ে বিস্মৃতির কবল থেকে রক্ষা করেছেন। পঞ্চমত, বাংলাদেশে যেখানে বৈষ্ণবধর্মে 'কান্তাপ্রেমসর্বসাধ্যসার' এবং রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি, সেখানে বিদ্যাপতি রাধাপ্রেমের বিশিষ্ট রূপকার হওয়ায় সহজেই মধুর রসের রসিক বাঙালীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন এবং বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন। বস্তুত বাংলাদেশে বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলীর নবজন্ম হয়েছে। মিথিলা তাঁর জন্মভূমি বটে কিন্তু তাঁর চিরন্তন বাসভূমি বাঙালীর হৃদয়মন্দিরে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন—"বাঙালী বিদ্যাপতির পাগড়ী খুলিয়া লইয়া ধুতি চাদর পরাইয়া দিয়াছে।"

কবিকথা॥ বিদ্যাপতি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাংশে মিথিলায় বিসফি গ্রামে আবির্ভূত হন। পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ, অন্ততঃ ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে জীবিত

ছিলেন তার সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে। ঠাকুর উপাধিধারী এক সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। তাঁর পূর্বপুরুষদের অনেকেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং মিথিলার রাজসভায় রাজসেবক ছিলেন। কবি নিজেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মিথিলার রাজা কীর্তিসিংহের আমলে তিনি রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হন। এ সময়েই অবহট্‌ঠ ভাষায় 'কীর্তিলতা' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। 'কীর্তিলতা' ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় ভূপরিক্রমা, পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, শৈব-সর্বস্বসার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। স্বদেশে হরগৌরীবিষয়ক পদরচনার জন্য কবি অধিক বন্দিত। কিন্তু বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদরচনার জন্যই কবির বিপুল সমাদর। প্রকৃতপক্ষে, লোকভাষায় সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদরচনার গৌরব বিদ্যাপতির প্রাপ্য এবং এক্ষেত্রে তিনি স্বরাট্‌ও বটেন। তাঁর পদগানের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, অলঙ্কারিক কারুকার্য ও রূপকল্পের বিপুল বৈভবকে আর কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। তাই সমালোচক যখন তাঁকে মধ্য যুগের 'কবিসার্বভৌম' বলেন, তখন তা অত্যুক্তি মনে হয় না।

বিদ্যাপতি যৌবন বয়সে মিথিলার রাজসভায় পদাবলী রচনা শুরু করেছিলেন, অনুমান। তাঁর বেশ কিছু-সংখ্যক পদে মিথিলার রাজা শিবসিংহ ও তাঁর সহধর্মিণী লছিমা দেবীর উল্লেখ থাকায় এই ধারণা হয়। পৃষ্ঠপোষক রাজাদের অবস্থার বিপর্যয়ের জন্য বার্ধক্যে কবিকে বেশ কিছুকাল দুরবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়। কবির ধর্মমত কি ছিল এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। হরগৌরী-বিষয়ক পদরচনার জন্য একদল তাঁকে শৈব মনে করেন। অপরদিকে, রাধাকৃষ্ণের পদরচনার জন্য তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, এমন ধারণাও করা হয়। খুবসম্ভব তিনি পঞ্চোপাসক স্মার্ত ছিলেন।

কাব্যকথা ॥ বিদ্যাপতি প্রাক্‌চৈতন্য কবি। ফলে শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনের ছোঁয়ায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় যে অপার্থিব দ্যুতির সঞ্চার হয়েছে, স্বভাবতই তাঁর পদে তা নেই। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের প্রেমে শিরাউপশিরায় স্পন্দিত রক্তমাংসের সাধারণ মানব-মানবীর প্রণয়-ছবিই প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে বিদ্যাপতি অপূর্ব প্রতিভাবলে এই পার্থিব প্রেমের ছবিতে এক অলৌকিক অমর্ত্যআভা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীতে লৌকিক ও ঐশ্বরিক এই উভয়বিধ প্রেমেরই অতুলনীয় মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। মানবীয় প্রেম দিয়ে তাঁর রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সূচনা—এই প্রেমের মাধুর্য ও রহস্য নিয়ে এর বিকাশ এবং এর পরিণতি ঐশ্বরিক প্রেমে। বয়ঃসন্ধি এবং পূর্বরাগের পদে বিদ্যাপতির যে রাধাকে দেখি, সে রাধা লীলাচপল, ভ্রূবিলাসঅভিজ্ঞ মোহিনী যুবতী। এই রাধাই অভিসারের ক্ষুরধার-নিশিত পথে পদচারণা করে বিরহের অগ্নিস্নানে পরিস্নাত, পরিশুদ্ধ হয়ে প্রৌঢ়-পারাবতী।

বয়ঃসন্ধি থেকে মাথুর বিরহের আর্তি পর্যন্ত পদগুলির মধ্যে রাধার প্রেমের যে অমরাবতী গড়ে তুলেছেন, তা তাঁর কবিকৃতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

বয়ঃসন্ধির পদ-রচনায় বিদ্যাপতি একক—আশ্চর্য ব্যাপার, এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী নেই, উত্তরসূরীও নেই। খুবসম্ভব চৈতন্যোত্তর কবি-দৃষ্টিতে রাধা মহাভাব-স্বরূপিণী প্রেমঠাকুরাণী হওয়ায় তাঁর লৌকিক জীবন-বিকাশ দেখতে কোন কবিই উৎসাহী হননি। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির রাধা তাঁর কবিমনোলোকে সৃষ্ট অভূতপূর্ব নারীপ্রতিমা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত সংসারদৃশ্য থেকেই কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আলোড়িত তন্বী রাধার রূপচিত্রণের উপাদান সংগ্রহ করেছেন—তাই তা জীবন্ত, বাস্তব। কবির সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান এবং শিল্পবোধের যে পরিচয় এ পদগুলিতে মেলে, তাতে এগুলি পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর কবিতার সমকক্ষ হবার দাবী রাখে। কবি ধীরে ধীরে কুশলী রূপদক্ষের মত কিশোরী রাধার জীবনে যৌবন-আবির্ভাবের একটি কান্তিময় আলেখ্য এঁকেছেন। দু-একটি পদাংশ উদ্ধৃত করে সে রূপচিত্রের আভাস দেই—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহু বাঁধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি॥—ইত্যাদি

দেহের রূপান্তর শুধু নয়, মনের রূপান্তর—কৈশোরের গোধূলি-আকাশে যৌবনআঁধারের নিপুণ রহস্যময় আবির্ভাব—চিত্র ও সঙ্গীতরসে কবি বিদ্যাপতি অপরূপ গড়ে তুলেছেন। সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে এই কবিকল্পনার জুড়ি আর নেই।

বয়ঃসন্ধির আলো-আঁধারির ছায়াপথে রাধার জীবন-অঙ্গনে পুষ্পধন্বা একদিন চুপিসারে এসে দাঁড়ালেন। প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্য রাধাকে এনে দাঁড় করালেন পূর্বরাগের বেদীমূলে। শুরু হল রাধার নতুন জীবনের অধ্যায়। একদিন যমুনাপুলিনে তরুমূলে দাঁড়ানো রাধার চোখে এসে পড়ল কৃষ্ণের কাজল-কালো চোখের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টির পরশে রাধার অন্তরে হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। এক অজানিত পুলক শিহরণে ভরে উঠল তার দেহমন। এক মোহময় আবেশে রাধা অনুভব করল হৃদয়বিতানে প্রেমের মধুময় অভ্যুদয়। সেই অনুভবের আনন্দস্মৃতি রোমন্থন করে রাধা বলছে—

তরুতলে ভেটল তরুণ কানাই।
নয়ন-তরঙ্গে জনি গেলিহু সনাই॥
এতদিন অছলিহু অপনে গেয়ানে।
আবে মোরা মরণ লাগল পাঁচবাণে॥

রাধা কৃষ্ণ-অনুরাগিণী হল আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণও হল রাধা-অনুরাগী। কৃষ্ণের চোখে হঠাৎ দেখা যুবতী রাধার অপরূপ দেহের লাবণ্য আকাশে বিদ্যুৎরেখার মত জড়িয়ে রইল। তার সেই রূপমুগ্ধতার অনিন্দ্য ছবি বিদ্যাপতির এই পদাংশে অবিমল ফুটে উঠেছে—

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহা তাঁহা সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ॥

কেবলমাত্র দেহরূপমুগ্ধতার নয়, প্রকাশ পেয়েছে বিমূর্ত সৌন্দর্যের বেদীমূলে পূজারী এক প্রেমিক পুরুষের ভক্তিনম্রতা। বিদ্যাপতি রাধার কৃষ্ণ-অনুরাগের রূপটি তেমন প্রণয়দীপ্ত করে ফোটাতে পারেননি। কিন্তু কৃষ্ণের রাধা-প্রেমমুগ্ধ যে চিত্র এঁকেছেন, তা পদাবলী-সাহিত্যে বিরল। গোধূলির আলো-আঁধারির স্বপ্নমায়াঘন ক্ষণে রাধা মন্দির হতে বেরিয়ে পথে নেমেছে, কৃষ্ণ হঠাৎ তাকে দেখেছেন। কৃষ্ণের মনে হল ঘনায়মান মেঘবরণ আঁধারের বুকে যেন একটুকরো বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। 'থিরবিজুরী বরণ গোরী' রাধার রূপের দ্যুতিতে ধাঁধিয়ে যাওয়া কৃষ্ণের বিস্ময়-উল্লাস কি অপরূপ বাক্-প্রতিমায়ই না বিদ্যাপতি ফুটিয়ে তুলেছেন—

জব গোধূলি সময় বেলি।
ধনি মন্দির বাহির ভেলি॥
নব জলধর বিজুরি-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি॥

—শব্দৈশ্বর্যের গৌরবে, অলঙ্কারের ব্যঞ্জনায় এ এক মহতী কবিতা।

প্রেমোদ্বেলিত দুটি নরনারী মিলনের বাহুডোরে বাঁধা পড়তে চায় কিন্তু সমাজ তার কঠোর রক্তচক্ষুর শাসন নিয়ে দুজনার মাঝে এসে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ পরপুরুষ, রাধা পরস্ত্রী। এ দুয়ের মিলন যে অবৈধ—সমাজ কখনো তাকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। কিন্তু হৃদয়গুহায় যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, তার গতি দুর্নিবার হয়ে উঠে। যমুনাপুলিনে কদম্বের মূলে 'রাধা রাধা' বলে কৃষ্ণের বাঁশি বাজে। সে বাঁশির ডাক শুনে কুলবধূ রাধার ঘরে থাকা দায়—তামসী রাত্রির নীল নিচোলে সারা অঙ্গ ঢেকে গোপন অভিসারে রাধা পথে বেরোয়। লোকলজ্জা, কুল, মান, পথের ভয় তুচ্ছ করে ছুটে চলে দয়িতের মোহময় করুণ আহ্বানে—

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥

একলি করল পয়ান।
পথ বিপথ নাহি মান ॥

বিদ্যাপতি রাধার এই অভিসার-যাত্রার যে দুর্মর ছবি এঁকেছেন, তা পদাবলী-সাহিত্যে তুলনারহিত। রাধার মর্ত্যপ্রেমে এখানেই লেগেছে অমর্ত্যপ্রেমের দিব্য আভা। লৌকিক পাপপুণ্যকে অস্বীকার করে, মেঘগর্জনমুখর বজ্র-বিদীর্ণ রাত্রিতে বর্ষাস্ফীত ভয়ঙ্কর নদী পার হয়ে, সর্পসঙ্কুল কর্দমপিচ্ছিল কণ্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে রাধা যেভাবে দয়িতের কাছে পৌছয়, তা কোন মর্ত্যমানবীর পক্ষে সম্ভব বলে বিশ্বাস হয় না। আর এ কারণেই অভিসার-যাত্রায় আভাসিত হয়ে ওঠে ভগবানের প্রতি ভক্ত মানবাত্মার বাধাবন্ধহীন ঊর্ধ্বাভিযানের ব্যাকুল আগ্রহ, জীবাত্মা-পরমাত্মার লীলার রূপক-ব্যঞ্জনা। বিদ্যাপতির রাধা প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তার সব লীলালাস্য, চাপল্য ত্যাগ করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী এক তাপসীমূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রাধার অভিসার-পরিকল্পনা বিদ্যাপতির মৌল সৃষ্টি নয়। প্রাচীন কাব্যকলার, জয়দেবের কাব্যরীতির অনুবর্তন এতে স্পষ্ট কিন্তু সেই পুরাতন ভাববস্তুতে বিদ্যাপতি যে নবীন সৃষ্টির চমৎকারিতা দেখিয়েছেন, তাতেই তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্ব।

অভিসার-যাত্রার শেষে মিলন। নিবিড় আশ্লেষে মিলনরভসে কেটে যায় রজনী। বিদ্যাপতি এই মিলনের বর্ণনায়ও সমুচ্চ কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। মিলনের মদির আবেশে দিবসরজনী যাপনের মাঝে একদিন বেজে ওঠে বিরহের করুণ রাগিণী। মথুরা থেকে কৃষ্ণের ডাক আসে। বৃন্দাবনের বিপিন-কুঞ্জ শূন্য করে একদিন চলে যায় কৃষ্ণ আর অশ্রুর প্লাবন নামে কৃষ্ণবিয়োগাতুর রাধার ম্লানপাণ্ডুর কপোল বেয়ে। এক নিঃসীম শূন্যতায়, কারুণ্যের হাহাকারে রাধা গুমরে গুমরে কাঁদে, কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বেদনার্ত আক্ষেপ—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল ॥...
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি ॥

শূন্য হৃদয়ে শূন্যতাবোধের এই বিস্ময়কর অনুভূতি বিদ্যাপতি শব্দের তুলিতে কি সুনিপুণ ফুটিয়ে তুলেছেন। বিরহবেদনার এরূপ সার্থক বাণীকার পদাবলী-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। বিদ্যাপতি এখানে অনন্য। বিরহের অগ্নিস্নানে পরিশুদ্ধা রাধা জ্যোতির্ময় স্বর্ণদীপ্তিতে ভাস্বর। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশ্লেষে সামান্যতম ব্যবধানও ছিল রাধার অসহ্য। তাই রাধা মিলনক্ষণে হার, চন্দন, বসন দূরে সরিয়ে রাখত। সেই পিয়া আজ নদীগিরির ব্যবধানে দূরতর দেশে। রাধার হৃদয় বেদনায় ক্ষতবিক্ষত

হয়ে ওঠে, 'পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা'।

অমলিন প্রেমস্মৃতি ব্যাকুল-করা বাঁশী বাজায়—কৃষ্ণধ্যানে, কৃষ্ণস্মরণে রাধার কেটে যায় দিন, মাস, বছর। প্রতীক্ষার প্রহর গুণে গুণে বাসি ফুলের মালার মত মলিন, শীর্ণ হয়ে ওঠে রাধা। তবু কৃষ্ণ আসে না। রাধা চিরবিরহের সমুদ্রপারে নির্বাসিত—কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎদর্শনের কোন সম্ভাবনাই নেই। আশ্চর্য ব্যাপার, এই মিলনের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাহীন পটভূমিতে বিদ্যাপতির অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণক্ষমা-প্রজ্ঞা সৃষ্টি করেছে রাধাকৃষ্ণের মিলনের এক অভিনব মায়ালোক। এই মিলনই ভাবসম্মিলন। বিরহের তীব্রতায় রাধা ক্ষণে ক্ষণে মনে করে এই বুঝি তার শ্যাম ফিরে এসেছেন এবং তার সঙ্গে গভীর মিলনে আবদ্ধ হয়েছেন। কল্পনায় এই যে মিলন, তাই ভাবসম্মিলন। রাধা বিরহের মাঝে অনুভব করে চিরমিলনের আনন্দ-রসধারা। তাই সখীকে অবিস্মরণীয় উল্লাসে বলে—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

এই ভাবসম্মিলনের মধ্যেই বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার উপরে যবনিকা টেনেছেন। ভাবসম্মিলনের পরিকল্পনা বিদ্যাপতির সম্পূর্ণ নিজস্ব।

ভাবসম্মিলনের মত প্রার্থনার পদরচনাতেও বিদ্যাপতি পথিকৃৎ। হৃদয়ার্তি এবং অন্তর্বেদনা তাঁর এই পদগুলিতে অপরূপ কারুণ্যে ফুটে উঠেছে। কবি মাধবের কাছে যখন মিনতি করে বলেন—

দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।

—তখন কবির এই আত্মনিবেদন একান্ত মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

বিদ্যাপতির কবিত্ব অনুপম, চিত্রাঙ্কনশক্তি অসাধারণ। গীতিকবির একটা বড় লক্ষ্য চিত্র-সৃষ্টি। বিদ্যাপতি ঠিক আধুনিক অর্থে গীতিকবি না হলেও তাঁর চিত্রাঙ্কনশক্তি যে-কোন প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির সমতুল্য। বিদ্যাপতির কবিভাষা বৈদগ্ধ্যে শাণিত, কাব্য মণ্ডনকলায় উজ্জ্বল। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি আর এ কারণেই তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে অনবদ্য গঠনসুষমা। তাঁর পদাবলী স্মরণীয় সূক্তি, সুভাষিত-সংগ্রহ ও প্রণয়কলাবিলাসের অভিজ্ঞতার নিদর্শনে ভরা। সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গাররসের পরিবেশনে, কবিকল্পনার চাতুর্যে ও মাধুর্যে তিনি 'অভিনব-জয়দেব'।

চণ্ডীদাস ও তাঁর পদাবলী

কবিকথা॥ বৈষ্ণবকবিতানিকুঞ্জে চণ্ডীদাস পিককুলপতি। তাঁর পদগানের পঞ্চম-স্বরে আপামর বাঙালী মুগ্ধ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস কজন, কোথায় কার জন্মভূমি, কোন্ জন প্রাক্‌চৈতন্য, কোন্ জন পরচৈতন্য ইত্যাদি নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে, তার সমাধান এখনো হয়নি। আমরা এখানে প্রখ্যাত পদাবলীকার চণ্ডীদাস সম্পর্কেই আলোচনা করছি। চণ্ডীদাসের ব্যক্তি পরিচয় অন্ধকারে ঢাকা। কবে কোথায় তাঁর জন্ম—সঠিক বলা সম্ভব নয়। কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে তিনি বর্তমান ছিলেন, এটুকু বলা যায়।

কাব্যকথা॥ "পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য"। চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রেমাশ্রুর স্বর্গলোক। চণ্ডীদাস প্রেমের যে কামনাহীন মাধুর্য বর্ণনা করেছেন, তা অনাস্বাদিতপূর্ব। প্রথমেই, কাব্যের সূচনাতেই তাঁর প্রেমগীতি পার্থিব জগৎ ছেড়ে অপার্থিব জগতের দেশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত উর্ধ্বে ডানা মেলে উড়েছে। নরনারীর পূর্বরাগের কমল ফোটে সাক্ষাৎদর্শনের অরুণ-কিরণ-সম্পাতে। কিন্তু চোখে না দেখেও কেবলমাত্র নাম শুনে একের অন্যজনকে হৃদিতনুমন সমর্পণের দৃষ্টান্ত মানুষী ভালবাসার সাহিত্যে বিরল। চণ্ডীদাসের রাধার মধ্যে এই অ-পূর্ব প্রেমের দৃষ্টান্ত পাই। রাধা শ্যাম-নাম শুনেই প্রেমতাপসী। বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে সখীদের বলে—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

চণ্ডীদাসের রাধা প্রথম থেকেই কৃষ্ণগতপ্রাণা। চণ্ডীদাস পূর্বরাগের একটি পদে তাঁকে যৌবনে যোগিনী করে অঙ্কিত করেছেন—সমাহিতচিত্তা তপস্বিনীর মত সেখানে রাধা কৃষ্ণ-ধ্যানতন্ময়—

বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা।

মুহূর্তের দেখার মাঝে কৃষ্ণের রূপজ্যোতি মনের পটে চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে গেছে—সেই রূপজ্যোতিকে রাধা অনুভব করে চারিপাশের পরিদৃশ্যমান বস্তুর মাঝে। যে যে বস্তুর বর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের নবঘননীল রূপের সাদৃশ্য রয়েছে, রাধা অপলক সেই সেই বস্তুকে দেখে নিবিড় একাগ্রতায়—

একদিঠ করি ময়ূর ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।

কৃষ্ণপ্রণয়-মুগ্ধা রাধার অন্তর বেদনাদিগ্ধ। মুহূর্তের দেখায় যাকে হৃদয় দিয়েছে সঁপে,

তাকে নয়ন-সমুখে নিবিড় করে পেতে চায়। তার দর্শন পাবার জন্য চিত্ত উন্মনা, বেদনাতুর হয়ে ওঠে। তাই রাধা ঘরের ভিতর-বার করে নিরন্তর—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

প্রেমপূজারিণী রাধা। তার আয়ত চোখের কালো মণির সরোবরে কাঁপছে নবজলধরবর্ণ এক শ্যাম পুরুষের মোহন মধুর ছবি। সেই শ্যামপুরুষ তার সমস্ত ভুবন জুড়ে রয়েছে। রাধার প্রণয়ে উল্লাস নেই, আছে ঘননীল বেদনা। সে বেদনা কাউকে বলার নয়, রাধা তাই বলে—

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত॥

যমুনার কালো জল চোখের সামনে ঝলমল করতে থাকে। তা দেখে মনকে ধরে রাখা দায়। যমুনার সেই উছল কালো জল যে দয়িতের প্রাণ-ভুলানো ঝলমলে কালো রূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়॥

রাধার প্রণয়বেদনাকে কত সহজ ভাষায় অথচ গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।

কৃষ্ণ-প্রেমের শরে বিদ্ধা হরিণী-রাধার ক্ষতহৃদয়ে রক্ত ঝরে। সেই রক্ত ঝরার যন্ত্রণায় কণ্ঠে ধ্বনিত হয় করুণ আক্ষেপ। আর সেই আক্ষেপের বাণীমূর্তি রচনায় চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভা শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্নকে ছুঁয়ে গেছে। দুঃখের ক্রন্দনে পদগুলি মধুর। সহজ সরল ভাষায় হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণাকে এমন মর্মস্পর্শী করে প্রকাশ আর কোন কবি করতে পারেননি। আক্ষেপানুরাগে চণ্ডীদাস তুলনাহীন।

যে প্রিয়ের জন্য রাধা কলঙ্কের ডালি মাথায় করে নিয়েছে, সেই প্রিয় আজ তাকে উপেক্ষা করে অন্যাসক্ত। এর আঘাত কঠিন—তার চেয়েও কঠিন সেই আঘাতের যন্ত্রণাকে ভাষায় প্রকাশ। কিন্তু চণ্ডীদাস অবলীলায় মাত্র সামান্য কটি কথায় রাধার সেই অন্তর্ব্যথাকে সুপরিস্ফুট করেছেন। রাধা কেবল বিনম্র উচ্চারণকরেছে—

আমার পরাণ যেমতি করেছে
তেমতি হউক সে।

অপরূপ ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে ছত্র কটি। প্রিয়জনহারা জীবনের যে কি কষ্ট, সেই নারী যে তার দয়িতকে ছিনিয়ে নিয়েছে যেন অনুভব করে তার জীবনে। শাশ্বত প্রেমসত্যের গভীরতম অনুভূতির এমন নিরাভরণ প্রকাশ অকল্পনীয়। রাধার এই অশ্রুশ্বসিত বিলাপ আমাদেরও মনের তারে ঘা দিয়ে এক করুণ বেদনার মর্মদাহ সৃষ্টি করে।

(৩) চণ্ডীদাস শুদ্ধতম বেদনার কবি। তাঁর পদাবলীর ভিতর দিয়ে এই বেদনাই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করেছে। তাই মিলনের মাঝেও তাঁর প্রেমিকযুগল বিরহের গোধূলিমলিন অস্তরাগের ভাবনায় ম্রিয়মাণ—

দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

মাথুর-বিরহের পদে চণ্ডীদাস অনুপম। এখানে প্রেমের যে গভীরতা ও ঐকান্তিকতা দেখিয়েছেন, তা রসোৎকর্ষে নিটোল, ভাস্বর। যৌবনের প্রত্যুষে যার প্রেমকিরণস্পর্শে রাই-কমলিনী চোখ মিলে তাকিয়েছিল, যাকে নয়নের অঞ্জন, মাথার ফুল, গলার হার করে নিয়েছিল, সেইজন আজ দূরে বহু দূরে। রাধা তার আসার আশায় দিন কাটায়। প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হয়, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে। সচকিত হরিণীর মত চঞ্চল হয়ে সখীকে বলে—

দেখ বাহির দুয়ারে
কানু কি আয়ল গেহা।
আজু সে রজনী সফল মানিয়ে
তবে সে সফল দেহা॥

নিশিদিন যার মিলন-আকাঙ্ক্ষায় কাটে, সেই প্রিয়তম একদিন আসে। বনপথে নয়, মনপথে আসে। সুদীর্ঘ বিরহের পর কল্পনায় পুনর্মিলনের মধুলগ্নে চণ্ডীদাসের রাধার কণ্ঠে শুনি মৃদু উচ্চারণে কটি নম্র কথা—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥…
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥

বিরহবেদনালীনা রাধার কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, অভিমানক্ষুব্ধতা নেই—কেবল একটা করুণ জিজ্ঞাসা 'মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল'। এ তো রাধার বাণী নয়,

এ যেন স্বয়ং কবিরই জীবনসিন্ধুমথিত বেদনা-উদ্বেল মর্মভেদী জিজ্ঞাসা। চণ্ডীদাস অনেক ক্ষেত্রেই রাধাহৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম। রাধার হৃদয়বেদনা অনেক ক্ষেত্রে কবিরই হৃদয়বেদনা। কবি-আত্মার নিষ্কাষিত বেদনার মাধুর্যে যেন গড়া হয়েছে বিষণ্ণ-মলিন রাধার সৌন্দর্যপ্রতিমা।

(১০) আত্মনিবেদনে চণ্ডীদাস সার্থক। তাঁর রাধা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত করেছেন কৃষ্ণের পায়ে। তাই কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার কণ্ঠে আশ্চর্য সহজতায় উচ্চারিত হয়—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥

চণ্ডীদাসের রাধার কৃষ্ণের প্রতি আত্ম-নিবেদন শুধুমাত্র প্রেমাকর্ষণ নয়। তা যেন চিরসুন্দরের পায়ে, আরাধ্য দেবতার পায়ে ভক্ত-হৃদয়ের আত্মবিলোপী সমর্পণ। চণ্ডীদাসের পদ এভাবেই পার্থিব প্রেমজগতের বেড়া ডিঙ্গিয়ে এক অপার্থিব প্রেমের তোরণ-দ্বারে সমুত্তীর্ণ হয়েছে।

চণ্ডীদাসের ভাষাভঙ্গিমা, ছন্দোপ্রকরণ, বাণীবিন্যাস বড় সাদাসিধে যূথিকার শুভ্র সুরভিমেদুর নির্মলতায় ভরা। 'কানুর পীরিতি, চন্দনের রীতি, ঘষিতে সৌরভময়', 'জল বিনে মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে' প্রভৃতি বাক্যে বৈদগ্ধ্যের খরশাণিত বিদ্যুদ্দীপ্তি (11)
নেই, আছে ভোর আকাশের স্নিগ্ধ তারার নম্র আলোর দ্যুতি। এগুলি প্রতিদিনের জীবন থেকেই আহৃত—অতি সাধারণ অথচ এর মধ্য দিয়ে অসাধারণের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। চণ্ডীদাস সহজতম কবিভাষার জনক। মহত্তম আবেগের সরলতম প্রকাশের জন্য তাঁর কবিতা চিরসার্থক।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে কবিপ্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ এ বিচার নিরর্থক। দুজনেই রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরের শ্রেষ্ঠ পূজারী। এ দুজনার কাব্য আলোচনা করলে মনে হয়, চণ্ডীদাসের কাব্য ভাবের অতল সমুদ্র এবং বিদ্যাপতির কাব্য রূপের তাজমহল। কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ উভয়ের যে মূল্যবিচার করেছেন, তা প্রণিধেয়—"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনে সুখ নাই। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য। চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক, চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।"

অনুবাদ সাহিত্য

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-সাহিত্য একটি বিশিষ্ট শাখা। এই শাখাটি দীর্ঘকাল ধরে বহমান ছিল। বর্তমানেও অনুবাদ-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা। সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত-পুরাণাদির বঙ্গানুবাদকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনুবাদ—এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর। এই অনুবাদের পদ্ধতি অনেক প্রকারের হতে পারে। কেউ হুবহু মূলের আক্ষরিক অনুসরণ করে অনুবাদ করেন, তা মূলানুবাদ। কেউ বা ভাবানুবাদ করেন, এতে মূলের অবিকল অনুসরণের প্রয়োজন থাকে না। কেউ বা মূল ঘটনাকে সংক্ষেপে বিবৃত করেন—এ অনেকটা সংক্ষিপ্তসারের মত। এতে মূলের ভাষা-ভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখার দরকার হয় না। সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের যে বিপুল অনুবাদ-সাহিত্য এদেশে গড়ে উঠেছিল, তাতে অল্পবিস্তর উপর্যুক্ত পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। তবে ভাবানুবাদই বেশী। ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে কবিরা মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে অনুসরণ করেছেন বটে, তবে প্রায়শই সেই কাহিনীকে নিজের ইচ্ছামত বর্ণনা করেছেন। মূল গ্রন্থে নেই এমন অজস্র উপাখ্যানও জুড়ে দিয়েছেন।

অনুবাদ-সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে দুটি প্রেরণা স্বীকৃত হয়ে থাকে। কেউ বলেন, মুসলমান আক্রমণের ফলে হিন্দু-সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন দেশের এই সঙ্কটমুহূর্তে ভাষায় সংস্কৃত-পুরাণাদি পরিবেশন করে হিন্দু-সাধারণকে উদ্দীপিত করার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। ভাষায় 'পুরাণ-প্রকাশ' লোকনিস্তারের অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়। আবার কেউ বলেন, গৌড়ের সুলতানেরা সিংহাসনে সুস্থিত হয়ে রাজসভায় পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার আগ্রহ দেখান, আর তা থেকেই এ সব গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলা সাহিত্যের আদি ইতিহাসকার ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই মতের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—"মুসলমান ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজা-মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ; মহরম্, ঈদ্, সবেরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল, রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদের ধর্ম, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল। গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল।"

কৃত্তিবাস ওঝা ও তাঁর রামায়ণ

কবিকথা॥ কৃত্তিবাস ওঝা* বাংলা রামায়ণের আদি কবি। তিনিই সর্বপ্রথম সংস্কৃত রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অমর রচনা বাঙালীর সবচেয়ে বড় আদরের ধন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের—আজ সেই কবির জীবনপরিচয় আর তাঁর কাব্য-পরিচয় সঠিক জানার উপায় নেই। তাঁর রচনা বলে যে রামায়ণ আমরা আজ পড়ি, তাতে তাঁর রচনার বিন্দুমাত্র অংশ আছে কিনা সন্দেহ। শত শত গায়েনের মুখে তাঁর রামায়ণ গান গীত হয়েছে। গায়েনরা ইচ্ছামত নানা অংশ বর্জিত, সংযোজিত ও পরিবর্তিত করেছেন। আর তাছাড়া, পুথিলিপিকারেরা তাঁর পুথি নকল করার সময় ভাষা বহুবার মার্জিত, শুদ্ধ করেছেন। ঠিকমত কবি-ব্যবহৃত শব্দটির পাঠোদ্ধার করতে না পেরে ইচ্ছামত নিজের 'কল্পিত শব্দ' বসিয়ে দিয়েছেন। এভাবে শত শত কৃত্তিবাসের রচনা এতে আত্মগোপন করে আছে। কৃত্তিবাসের কবিপ্রতিভার বিচার এই বহুধা পরিবর্তিত ও উনিশ শতকের গোড়ায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরিমার্জিত এবং অধুনা প্রচলিত রামায়ণের উপর ভিত্তি করেই করতে হবে।

কৃত্তিবাসের ব্যক্তিপরিচয় জানার একটিমাত্র উপায় আমাদের আছে—তা কবির প্রদত্ত আত্মবিবরণী। এই আত্মবিবরণী কৃত্তিবাসের রচনা কিনা এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমরা মোটামুটিভাবে এই আত্মবিবরণীকে প্রামাণ্য ধরে নিয়ে কৃত্তিবাসের ব্যক্তিপরিচয় ও কালনির্ণয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আত্মবিবরণীটি সংক্ষেপে এই—

বঙ্গদেশে বেদানুজ নামে এক রাজা ছিলেন, নরসিংহ ওঝা ছিলেন এঁর সভাসদ। নরসিংহ কোন কারণে দেশ ছেড়ে এসে ভাগীরথীর তীরে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এঁরই বংশে কৃত্তিবাসের জন্ম। সংক্ষেপে কৃত্তিবাসের বংশলতিকা এই—

নরসিংহ ওঝা
|
গর্ভেশ্বর
|
মুরারি — সূর্য — গোবিন্দ
|
বনমালী (স্ত্রীর নাম মালিনী—কৃত্তিবাসের মাতা)
|
কৃত্তিবাস

---

* 'ওঝা' শব্দটি 'উপাধ্যায়' শব্দ থেকে উদ্ভূত, এটি ব্রাহ্মণের পদবী।

মুরারির সাতপুত্রের অন্যতম পুত্র বনমালীই কৃত্তিবাসের পিতা। ছয় ভাই ও এক বৈমাত্রেয় ভগিনীর মধ্যে কৃত্তিবাস ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তিনি মাঘমাসের রবিবার শ্রীপঞ্চমীতিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ নাম রাখেন 'কৃত্তিবাস'। বিদ্যাশিক্ষার জন্য বার বছর বয়সে পদ্মা নদী পার হয়ে কবি উত্তর দেশে গমন করেন। বিদ্যাশিক্ষায় সুখ্যাতি অর্জন করে গুরুকে যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে দেশে ফিরলেন। রাজপণ্ডিত হবার আশায় গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হলেন। পাঁচটি শ্লোক রচনা করে দ্বারীর হাতে রাজার কাছে পাঠালেন। দরবারের শেষে রাজা ডেকে পাঠালেন কৃত্তিবাসকে। নয় দেউড়ি পার হয়ে কবি পৌঁছলেন রাজসভায়। রাজা তখন মাঘমাসের রোদ পোহাচ্ছিলেন। তাঁর ডাইনে পাত্র জগদানন্দ, পাশে ব্রাহ্মণ সুনন্দ, বামে কেদার খাঁ, ডাইনে নারায়ণ, পণ্ডিত মুকুন্দ ইত্যাদি বিরাজ করছিলেন। কৃত্তিবাস স্বরচিত শ্লোকে রাজসম্ভাষণ করলেন। গৌড়েশ্বর শ্লোক শুনে আনন্দিত হয়ে পুষ্পমালা, পাটের পাছড়া দিলেন। কেদার খাঁ কবির মাথায় দিলেন চন্দনজল ছিটিয়ে। কৃত্তিবাস যা চাইবেন, রাজা তাই দিতে ইচ্ছা করলেন। পাত্রমিত্রও কৃত্তিবাসকে বললেন—"যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে।" কিন্তু কবি মাথা উঁচু করে জানালেন—

আর কিছু নাঞি চাহি করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার॥

নির্লোভ ব্রাহ্মণের দৃপ্ত উত্তরে পরম খুশী হলেন রাজা। কবিকে রামায়ণ রচনা করতে অনুরোধ করলেন। কবি কৃত্তিবাস রাজাদেশ শিরোধার্য করে রামায়ণ রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

এই আত্মবিবরণীর সাহায্যে কবির বংশপরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা সবই জানা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবকালটি জানা যাচ্ছে না। কবি জন্মতিথি, বার ও মাস সবই দিলেন, কিন্তু জন্ম-সনটি জানালেন না। কবি যে রাজসভায় গিয়েছিলেন, সেই রাজার নামটুকু জানলেও তাঁর আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা যেতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবি রাজার নাম জানাননি। যাই হোক, নানাদিক বিচার করে কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এটুকু বলা যায়।

কাব্যকথা॥ কৃত্তিবাসের রামায়ণ আদি, অযোধ্যা, আরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরা—এই সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। সরল ভাষায় ত্রিপদী ছন্দে রামায়ণের গল্পসার পরিবেশন করেছেন। বিশ্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্পরসের প্রতি প্রবণতা থাকায় এতে অনেক নতুন সরস উপাখ্যানও সংযোজন করেছেন। এসব উপাখ্যানের মধ্যে দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি,

তরণীসেন কাহিনী, রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ-হরণ প্রভৃতি উল্লেখ্য। প্রকৃতপক্ষে বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে কবি নিজের মনের মত করে রামায়ণকথা রচনা করেছেন। এখানেই কৃত্তিবাসের মৌলিকতা নিহিত। তাঁর কাব্য বাল্মীকির মহাকাব্য নয়, মধুর রাম-পাঁচালী।* অশিক্ষিত জনসাধারণের উপযোগী করে সরস, সহজ কবিত্বে রামকথা পরিবেশনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং সেদিক থেকে তিনি অসামান্য সফল। পল্লীর সামান্য মুদী থেকে উচ্চশিক্ষিত সবার কাছেই তাঁর কাব্যের সমাদর তার বড় প্রমাণ। সর্বশ্রেণীর বাঙালী আর কোন গ্রন্থকে এমন আপনার করে নেয়নি। কৃত্তিবাসের রামায়ণের কাব্যমূল্যের বিচারে এ তথ্য বিস্মৃত হলে তাঁর অপবিচারের সম্ভাবনা। কৃত্তিবাসের কবিত্বশক্তিতে সন্দেহে প্রকাশ করে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন—"বাল্মীকির কল্পনার বর্ণাঢ্য লীলা গৌড়ীয় কবির কল্পনাকে বিশেষ উদ্দীপ্ত করিতে পারে নাই। ……কৃত্তিবাসের বর্ণনায় চিত্রকূট পর্বত আমাদের ধান্য-ক্ষেত্রের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কল্লোলিত সমুদ্র বাংলাদেশের খালবিল জলাশয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ দুই জমিদারের কলহদ্বন্দ্বে পরিণত হইয়াছে। …কৃত্তিবাসের আদর্শ ছিল রামায়ন—মহাকবি বাল্মীকির অনুপম গ্রন্থ। অতএব পাণ্ডিত্যের বলেই তিনি তাঁহার রচনা কবিত্বের মাধুর্যে মণ্ডিত করিতে পারিতেন; অথচ রামায়ণের গল্প ব্যতীত ইহাতে আর কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না।"—এই প্রকার সমালোচনা যথার্থ নয়, ধারণা। কৃত্তিবাস পাণ্ডিত্য-সহকারে বাল্মীকির রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ যদি করতেন, তাহলে আমরা আর একটি নকল বাল্মীকি-রামায়ণ পেতাম সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালী জীবনের কমনীয়তায় পূর্ণ, বাংলার মাটির ঘ্রাণে-গন্ধে ভরা বাঙালীর জাতীয় কাব্য পেতাম না। কবিত্ব-ক্ষমতা অনুকরণে নয়, নতুন সৃষ্টিতে। কৃত্তিবাস পুরাতনের বুকে নতুনের সৃষ্টি করেছেন, তিনি স্রষ্টা। তিনি বাঙালীর মন নিয়ে বাঙালীর রসাস্বাদনের উপযোগী করে তাঁর বাংলা রামায়ণ রচনা করেছেন। এটি অনুবাদ নয়, এ এক নতুন সৃষ্টি।

কৃত্তিবাসের রচনায় সর্বতোমুখী কবিত্বের স্ফুরণ দেখা যায়। সংস্কৃত কাব্যরীতি ও অলঙ্কারে তাঁর অধিকার ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষার পক্ষে গুরুভার হবে এমন অলঙ্কার

*এক সময়ে বাল্মীকি রামায়ণের মূল কাহিমী কথকতা ও পাঁচালীর আকারে বাংলাদেশে সুপ্রচলিত ছিল। কথক ঠাকুর ও পাঁচালী গায়কগণ শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য মূল কাহিনীকে ইচ্ছামত বদলে নিতেন, কখনো বা নতুন গল্প যোগ করে দিতেন। ক্রমে কবিরা আবির্ভূত হলেন, অনুবাদ শুরু করলেন। কিন্তু পাঁচালার প্রভাব এড়াতে পারলেন না। কৃত্তিবাসও এর ব্যতিক্রব ছিলেন না। তাই তাঁর রামায়ণকেও রামায়ণ-পাঁচালী বলা হয়। পাঁচালী, মানে নাচগান সহযোগে যা পড়া হয় বা আবৃত্তি করা হয়, সেরকম কাব্য।

বা রীতি কবি পরিহার করেছেন। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবি আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনভূমি থেকেই চিত্রকল্প, রূপকাদি আহরণ করেছেন। কল্পনাশক্তির সহজ দ্যুতিতে সেগুলি ভাস্বর। যেমন, কুম্ভকর্ণের কাঁধে ঝুলন্ত বানরদের বর্ণনায় কবি বলছেন—"বাতুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।" লঘুভার এ উপমা চকিতে আমাদের বোধকে বিদ্ধ করে। করুণরসের প্রস্রবণ 'সীতাবিলাপ' তাঁর কল্পনাশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিষ্প্রাণ জড়বস্তুতে মানুষের ধর্ম আরোপ করা এবং তাকে অন্তরঙ্গ করে তোলা রোমাণ্টিক কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। সীতাবিলাপে এই রোমাণ্টিক কবিত্বের আভাস দেখা যায়। হনুমানের হাতে রামচন্দ্রের আংটি দেখে বিরহ-উন্মাদনায় সীতার আংটিতে জড়বুদ্ধি লোপ হয়েছে। চাঁদের আলোয় আংটির বিচ্ছুরিত দ্যুতি দেখে সীতা ভাবছেন রামচন্দ্র-হারা হয়ে আংটিও বুঝি কাঁদছে—তাই সীতার জিজ্ঞাসা—

জনম দুঃখিনী সীতা কান্দিবে সদাই।
হে অঙ্গুরি, কি কারণে কান্দ তুমি ভাই ॥

কৃত্তিবাসের এক একটি বজ্রগর্ভ সংক্ষিপ্ত উক্তির বিদ্যুদালোকে তাঁর পাত্রপাত্রীর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোকিত। যেমন,

যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষ পান করে ॥

এই একটি কথাতেই সমগ্র কৈকেয়ী-জীবন ছবির মত ফুটে উঠেছে। কৈকেয়ীর একদিনের ভুলের ফলে তাঁর চৌদ্দ বছর-ব্যাপী অনুশোচনা, ভরতের অনাদরে তাঁর ব্যর্থ মাতৃত্ব, রামের প্রতি অন্তর্গূঢ় স্নেহ ও পুঞ্জীভূত অভিমান—সমস্তই এই উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র গম্ভীর ও করুণ নয়, হাস্য ও কৌতুকরস সৃষ্টিতেও কৃত্তিবাসের কবিত্বের পরিচয় মেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয়তো ভাঁড়ামি হয়ে উঠেছে, তবে সেজন্য প্রাচীনযুগের শ্রোতৃমণ্ডলীর স্থূল রুচিই দায়ী।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তার তথা প্রসিদ্ধির মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি বর্তমান—

কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাত্রপাত্রী পুরাতন পৌরাণিক চরিত্র হলেও কবির হাতে তাদের নবজন্ম হয়েছে। তারা আচারে-ব্যবহারে, ভাবে-ভঙ্গীতে যথার্থ বাঙালী। বাল্মীকির অঙ্কিত চরিত্রগুলিতে যে দুর্বার বলিষ্ঠতা আছে, তা কৃত্তিবাসে নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের দশরথ বাংলারই স্ত্রৈণ বৃদ্ধ, রাম স্ত্রীগতপ্রাণ বাঙালী যুবক, সীতা লজ্জারাঙা কুলবধূ, রাবণ বাংলারই দুর্বৃত্ত জমিদার এবং মুনি-ঋষিরা পেটুক বামুন। মূল রামায়ণের ক্ষাত্রবীর্য, ব্রাহ্মণ্য তেজ, সংযত প্রেম ও অন্তর্গূঢ় ভক্তি কৃত্তিবাসে নেই, তার পরিবর্তে এতে আছে বাঙালীর আলস্যপরায়ণতা, ভোগবিলাসিতা, কলহপ্রবণতা

ও ভক্তিপ্রেমে ঢলঢল উদ্বেলতা। দোষেগুণে বাঙালী স্বভাবের এমন সুনিপুণ প্রতিচ্ছবি প্রাচীন আর কোন কাব্যে মেলে না। বাঙালীর ভক্ষ্য-ভোজ্য, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি সব কিছুই এতে সুন্দরভাবে ফুটেছে। ঋষি ভরদ্বাজ নিজ আশ্রমে রামচন্দ্রের বানরবাহিনীকে যে-সব ভোজ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন—তা বাঙালীরই প্রিয় খাদ্য-সামগ্রী। এতে আছে মতিচুর, মণ্ডা, মনোহরা, সরুচাকুলি, গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, খাজা, জিলাপি, পাঁপড় ইত্যাদি। চৌদ্দ বছরের উপবাসী লক্ষ্মণকে সীতা যে আহার্য পরিবেশন করেন—তা আমাদেরই ঘরের বধূদের দ্বারাই এভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে—

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সূপ আদি দিলেন সানন্দ ॥
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ ॥

নবজাতকের জাতকর্মের বর্ণনার কালে কবি বাংলাদেশের সামাজিক আচার-বিচারকেই স্মরণ করেছেন। রামচন্দ্রাদির জন্মের পর পাঁচ দিনে 'পাঁচুটি', ছয় দিনে 'ষষ্ঠীপূজা', আট দিনে 'অষ্টকলাই', ত্রয়োদশী দিনে 'জননী শৌচান্ত' ছয় মাসে 'অন্নপ্রাশন' প্রভৃতির বর্ণনা উল্লেখ্য।

মূল রামায়ণের কাহিনীই সকরুণ—তদুপরি কৃত্তিবাসের হাতে তা আরো করুণরসে নিবিড় হয়ে উঠেছে। স্পর্শকাতর ভাবপ্রবণ বাঙালীর কাছে এই করুণরসের প্রবাহ পেয়েছে গভীর সমাদর। দশরথ কর্তৃক অন্ধক মুনির পুত্রবধ, সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ইত্যাদি বাঙালীকে গভীর বেদনারসে আপ্লুত করেছে। সীতানির্বাসন, সীতার পাতালপ্রবেশ, রামচন্দ্রের সরযূ-সলিলে দেহত্যাগ প্রভৃতি মর্মান্তিক ঘটনায় বাঙালী নীরবে অশ্রুবিসর্জন করেছে এবং সেই সঙ্গে কবি কৃত্তিবাসও তাদের কাছে হয়ে উঠেছেন প্রিয়জন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে ভক্তিরসের আত্যন্তিক উচ্ছ্বাস লক্ষণীয়। বৈরী রাক্ষসকুল রামচন্দ্রের ভক্তরূপে কল্পিত—বিভীষণপুত্র তরণীসেন সর্বাঙ্গে রাম নাম লিখে যুদ্ধযাত্রা করে—এমন কি ভক্ত তরণীর কাটা মুণ্ড পর্যন্ত 'রাম' নাম বলে। একবার রাম-নাম উচ্চারণে জীবের মুক্তি—

রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা ॥

এই নাম-মাহাত্ম্য বাঙালীর গভীর ভক্তিপিপাসাকে দূর করেছে। তাঁর রাবণ রামচন্দ্রের শ্রীচরণদর্শন লোভেই সীতাহরণ করেছে—সীতা যে শক্তিরূপী মহালক্ষ্মী রাবণ

তা জানে। মুক্তিলোভাতুর রাবণ রামের হাতে মৃত্যু চায়—শত্রুতা না করলে যে মুক্তি মিলবে না—তাই তার বিরোধিতা। যুদ্ধকালে রাবণ রামচন্দ্রের স্তুতি করলে রামচন্দ্রও তাই বলেন—

কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রাম নাম না লইবে আর॥

—এই ভক্তিবাদ বাঙালীর জীবন ও সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত। কৃত্তিবাস বাঙালীর এই ভক্তিসংস্কারকে পরিতৃপ্ত করেছেন—তাই সারা বাংলায় তাঁর প্রসিদ্ধি।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ—এর গার্হস্থ্য জীবনরস। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি এতে সুপরিস্ফুট; ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা, পিতার প্রতি ভক্তি, পতির প্রতি শ্রদ্ধা, পত্নীর প্রতি প্রেম—যার উপর সমাজস্থিতি ও পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করে, রামকথা আশ্রয় করে কৃত্তিবাস স্বজাতির অন্তরে তা সঞ্চার করেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সুমধুর পারিবারিক জীবনের আবহ বাঙালীর জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। কৃত্তিবাস-পরিচায়িত ভ্রাতৃপ্রেমে বৈরাগী ভরত, বাৎসল্যে অধীরা কৌশল্যা, দাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হনুমান, সৌহার্দ্যে সুস্থির সুগ্রীব ও বিভীষণ জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে বাঙালীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে, পরিবারবন্ধনে ও সমাজসচেতনতায় শক্তি সঞ্চার করেছে। রামচন্দ্রের অকাল-বনবাসে বাঙালী অচিন্তিত দুঃখকে সহজে বরণ করতে শিখেছে। সীতার দুঃখময় জীবনকাহিনী শুনে বাঙালী বধূ অপার দুঃখেও স্বামীর অনুগত রয়েছে। লক্ষ্মণের দৃষ্টান্তে ভাই ভয়ঙ্কর বিপদে ভাইকে সাহায্য করেছে, রাবণের অনুতাপে পাপদগ্ধ বাঙালী ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে সঁপেছে। এই রামায়ণ বাঙালীর জীবনে যে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছে, তা অন্য কোন গ্রন্থ দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতবাসী যা চায়, রামায়ণ তাকে তাই দিয়েছে। কৃত্তিবাস বাঙালীর প্রাণের কবি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় কাব্য।

কালের অতল তলে কবির সৃষ্টি, তাঁর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব, যুগপরিচয় সব কিছু হারিয়ে গেছে—তবুও একদিন জাতীয় রসচেতনার উদ্বোধন-প্রসঙ্গে তিনি যে মধুচক্র রচনা করেছিলেন, "গৌড়জন তাহে আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি"; কৃত্তিবাস যথার্থই 'এ বঙ্গের অলঙ্কার।'

মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়

কবিকথা॥ মালাধর বসু বাংলা ভাষায় ভাগবতের প্রথম অনুবাদক। কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। কায়স্থবংশে জন্ম, পুত্রের নাম সত্যরাজ বসু। তাঁর পৌত্র রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও পার্ষদ ছিলেন। তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কোন কোন পুথিতে 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামও পাওয়া গেছে। এতে প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনার ইঙ্গিত আছে বলে শ্রীচৈতন্যদেব কবিকে অতি শ্রদ্ধা করতেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থে যে রচনাকালজ্ঞাপক পয়ার পাওয়া যায়, তা থেকে গ্রন্থটির রচনাকাল ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ দাঁড়ায়। কবির কাব্য-রচনাকাল থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, কবি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। খুবসম্ভব রুকনুদ্দিন বারবাক্ শাহ্ তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। জনসাধারণের কাছে সংস্কৃত ভাগবত বোধগম্য করে তোলার জন্যই তিনি অনুবাদকার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

কাব্যকথা॥ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের 'বিজয়' কথার অর্থ কেউ 'মৃত্যু', কেউ বা দেবতার 'বিজয়-গৌরব' বুঝেছেন। যে-কোন একটি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। কৃত্তিবাস-কাশীরামের রামায়ণ-মহাভারতের মত না হলেও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলাদেশে একদা জনপ্রিয় হয়েছিল। আর এ কারণেই তাঁর কাব্যে নানা প্রক্ষেপ-(একজনের রচনায় অন্যজনের রচনা ঢুকে পড়াকেই প্রক্ষেপ বলে) প্রাচুর্য রয়েছে। কোন কোন পুথিতে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একাধিক পদ দেখা যায়। মূল ভাগবতে 'রাধা' নামের উল্লেখ নেই। বাংলার বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে রাধাপ্রেম সর্বজনীন বিশেষ স্বীকৃতিলাভ করে চৈতন্যোত্তর যুগে। মালাধর চৈতন্য-পূর্বযুগের কবি। সুতরাং তাঁর কাব্যে 'রাধা' নামের ব্যবহার প্রক্ষিপ্ত, ধারণা হয়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নয়। বারটি স্কন্ধের মধ্যে মাত্র দুটি স্কন্ধের (দশম ও একাদশ সম্পূর্ণ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের আংশিক) সংক্ষিপ্ত সরল অনুবাদ করেছেন। যথাসম্ভব সংক্ষেপে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত কৃষ্ণলীলার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়াই মালাধরের উদ্দেশ্য ছিল। কবি এ কারণে, মূলের কাহিনীর অনেক তত্ত্বাংশ বাদ দিয়েছেন, প্রয়োজনবোধে ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধের কিছু কিছু উপাদান নিয়েছেন। এমন কি, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি থেকেও অংশবিশেষ নিয়েছেন। এ বিষয়ে কবির বিচক্ষণতা প্রশংসনীয় কারণ, এর ফলে শ্রীকৃষ্ণবিজয় একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র কাব্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তিনটি মূল ধারা দেখা যাবে। ১. আখ্যকাহিনী বা কৃষ্ণের

বৃন্দাবনলীলা, ২. মধ্যকাহিনী বা মথুরা লীলা, ৩. অন্ত্যকাহিনী অর্থাৎ দ্বারকালীলা। আদ্যকাহিনীতেও কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা যাত্রা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। মধ্যকাহিনীতে আছে কৃষ্ণের কংসবধ ও কংসের পিতা উগ্রসেনের নির্দেশে মথুরায় রাজ্যশাসন, অন্ত্য-কাহিনীতে জরা নামক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শরে কৃষ্ণের মৃত্যুকথা রয়েছে।

কেউ কেউ মালাধরের 'কবিত্বশক্তি' তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়' বলে মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যটি যথার্থ নয়, ধারণা। আবেগময়তায় এবং আন্তরিকতায় তাঁর রচনা কোথাও কোথাও বেশ কবিত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্বে গোপীদের বিলাপের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

আর না যাইব সখী কল্পতরু মূলে।
আর কানু সঙ্গে মালা না গাঁথিব ফুলে।
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥
অল্প ধনলোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥

কবির রচনায় বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের রূপও অনেক ক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে। সেদিক থেকেও তাঁর রচনা আস্বাদ্য। বৃন্দাবনের রাখালদের সঙ্গে কবির 'কৃষ্ণ' একসঙ্গে বসে ভাত খান। মা যশোদা ক্রীড়ারত শিশু কৃষ্ণকে ডেকে বলেন—"ভাত খ্যায়্যা পুনরপি খেলাহ আসিয়া।"—এ যশোদা আমাদের চিরচেনা, বাঙালীর ঘরে ঘরে এই মাতৃমূর্তি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাব্যমূল্য যাই হোক না কেন, এই রচনার একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। পরবর্তীকালের শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনার অরুণোদয়ের আভাস এতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণপ্রেমভক্তির যে মহিমময় রূপ শ্রীচৈতন্য নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন তার ইঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মেলে। এতে সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলা হয়েছে—"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।" শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পরবর্তী চৈতন্যযুগের রাগানুগা সাধনার অঙ্কুরলক্ষণ স্পষ্ট।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

কবিকথা ॥ পরাগল খাঁ নামে হোসেন শাহের জনৈক সেনাপতি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। এঁরই উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। এজন্য এ মহাভারতকে 'পরাগলী মহাভারত'ও বলা হয়ে থাকে। তাঁর কাব্যের প্রকৃত নাম ছিল 'পাণ্ডববিজয়'। কবি হোসেন শাহ ও পরাগলের নাম তাঁর কাব্যে বারবার উল্লেখ করলেও নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেননি। শুধু কাব্যে কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র পরমেশ্বর—এরূপ ভণিতা দিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন, তাঁর নাম পরমেশ্বর—'কবীন্দ্র' উপাধি। আবার কেউ কেউ বলেন, কবির নাম শ্রীকর নন্দী, 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' বোধ হয় পরাগল খাঁর প্রদত্ত উপাধি। কিন্তু শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর একই ব্যক্তির নাম এরূপ প্রমাণ মেলেনি। বরং দুজনের নামে মহাভারতের (অশ্বমেধ পর্বের মাত্র) দুটি আলাদা পুথি পাওয়া যাওয়ায় এঁরা স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, বলা চলে। কবির আবির্ভাব পঞ্চদশ শতাব্দীতে হয়েছিল বলা চলে।

কাব্যকথা ॥ কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত খুবই সংক্ষিপ্ত তবে তিনি অষ্টাদশ পর্বেরই অনুবাদ করেছিলেন, অনুমান। কবি মূলকে এড়িয়ে নতুন কাহিনী রচনার চেষ্টা করেননি বা পল্লবিত বর্ণনার আশ্রয় নেননি। রচনার প্রধান গুণ স্বচ্ছতা। পরিচ্ছন্ন, অনলঙ্কৃত বর্ণনা অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ না হলেও মোটামুটি সুখপাঠ্য। তাঁর রচনার দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল—

> পরিধান পীতবাস কুসুম বসন।
> নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন ॥
> মেঘের বিদ্যুৎতুল্য হসিত মুখেত।
> শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এ চারি করেত ॥

তৎসম শব্দের বাহুল্য থাকলেও এ ভাষার প্রসাদগুণ অবশ্যস্বীকার্য। কোন কোন ক্ষেত্রে কবি মিতপরিসরে চমৎকার চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন—

> জেন দুই অগ্নি আসি একত্রে মিলিল।
> ভীষ্ম ধনঞ্জয় দুই মিশামিশি হৈল ॥

কোন কোন ক্ষেত্রে আখ্যানের মধ্যে বেশ নাটকীয়তা লক্ষণীয়। পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের ব্যাপার নিয়ে কৃষ্ণ ও কর্ণের সংলাপের রীতিটি চমৎকার নাটকীয় হয়েছে। সংক্ষেপে কাহিনীটুকু বর্ণনা করাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সেদিক থেকে কবি সফল।

শ্রীকর নন্দী

কবিকথা ॥ পরাগলের পুত্র নসরৎ খান বা ছুটি খান হোসেন শাহের আমলেই

চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হয়েছিলেন। তিনিও গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। বাংলা ভাষায় পরবর্তী মহাভারত কাব্যের অনুবাদ এঁরই প্রেরণায় শুরু হয়। পরমেশ্বরের কাব্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছুটি খানকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। তাই তিনি আরো বিস্তৃত করে কাব্যরচনা করার জন্য তাঁর সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে অনুরোধ করেছিলেন। জৈমিনি মহাভারতের উপর নির্ভর করে কেবলমাত্র 'অশ্বমেধপর্ব' নিয়ে কবি বিশাল কাব্য রচনা করেন। পরমেশ্বরের কাব্যের কোন কোন পুথিতে শ্রীকর নন্দীর লেখা 'অশ্বমেধপর্বে'র কিছু কিছু অংশ ঢুকে গেছে। তাই গোড়ায় অনেকে অনুমান করেছিলেন, এ দুজন একই ব্যক্তি কিন্তু পরে তা সঠিক নয়, প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীকর নন্দীও কাব্যের মধ্যে হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। ফলে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সঙ্গে এঁর কাব্য-রচনাকালের ব্যবধান খুব বেশী হবে না, ধারণা। কবির আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতাব্দী—এটুকু ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই।

কাব্যকথা ॥ শ্রীকর নন্দী যে জৈমিনি মহাভারতের অনুসরণ করেছেন, সেকথা তিনি উল্লেখ করেছেন—

শুনিল ভারত-পোথা অতি পুণ্যকথা।
মহামুনি জৈমিনির পুরাণ-সংহিতা ॥
অশ্বমেধ-কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥

শ্রীকর নন্দীর অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলানুগ, তবে কিছুটা সংক্ষিপ্ত। যৌবনাশ্ব, অনুশাল্ব, নীলধ্বজ-জনা, প্রমীলা, বভ্রুবাহন, তাম্রধ্বজ, চন্দ্রহাস প্রভৃতির উপাখ্যানই এ কাব্যে প্রধানত বর্ণিত হয়েছে। জৈমিনির গ্রন্থে মাঝে মাঝেই রঙ্গব্যঙ্গের সুর আছে। মূলের অনুসরণে তিনি লঘু কৌতুক ও হাস্যরস সৃষ্টিতে বহু ক্ষেত্রেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের সঙ্গে ভীমের যাবার কথা উঠলে কৃষ্ণ বললেন, ভীম স্থূলোদর, পেটুক—এমন লোককে দুরূহ কাজে পাঠানো সঙ্গত নয়। এতে ভীম চটে উঠে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গে কৃষ্ণকে জবাব দিলেন—

তোহ্মার উদরে কৃষ্ণ বৈসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত ওদন ব্যঞ্জন ॥
তুমি স্থূলোদর নহে, আমি স্থূলোদর।
বিমর্শিয়া চাহ কৃষ্ণ দেব দামোদর ॥

ভীমের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ ভামকে আলিঙ্গন করলেন—"ভাল ভাল বলি ভীমে উঠি আলিঙ্গিল।" কবীন্দ্রের তুলনায় শ্রীকর নন্দীর রচনায় কিছুটা সভাকবিসুলভ লঘু চটুলতা লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবন

মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য কবিকর্ম। এর আখ্যানবস্তু বাংলার মাটির ঘ্রাণে ভরা বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের যা কিছু সব লেখা পদ্যে। এই প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানত দুটি ধারায় বহমান ছিল—(১) আখ্যান-কাব্য ও (২) গীতিকাব্য। মঙ্গলকাব্য এই প্রথম ধারারই আওতায় পড়ে।

নামকরণ॥ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লোকসমাজে পূজিত দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যে একশ্রেণীর কাব্য লেখা হয়েছিল, তাই মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ এই সময়সীমার মধ্যে তাই এই কালই মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক কাল। অবশ্য এই সময়সীমার বাইরে অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে।

'মঙ্গলকাব্য' কেন মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত হত, এ নিয়ে নানা মত বর্তমান। এক॥ যে গান মঙ্গলসুরে গাওয়া হয় কিংবা যে গান যাত্রা বা মেলায় গাওয়া হয়, তাই মঙ্গলকাব্য। দুই॥ যে কাব্য পাঠ করলে ও শ্রবণ করলে, এমনকি গৃহে রাখলেও গৃহস্থের সব অকল্যাণ দূর হয় এবং মঙ্গল হয়, তাই মঙ্গলকাব্য। তিন॥ যে গান এক মঙ্গলবারে শুরু করে পরের মঙ্গলবার পর্যন্ত গাওয়া হয়, তাই মঙ্গলকাব্য। চার॥ যে কাব্যে দেবতার 'বিজয়' অর্থাৎ মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত হয়েছে, তাই মঙ্গলকাব্য। এই কারণে কোন কোন কাব্যের নাম 'বিজয়' যুক্ত মেলে। যেমন, মনসাবিজয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাব্যই মঙ্গলকাব্য। 'মঙ্গল' শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্যাণ। ঋগ্বেদে এই অর্থ মেলে। মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' শব্দটিও শুভ ও কল্যাণের অর্থদ্যোতনা করে।

মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ॥ কোন্ শুভলগ্নে মঙ্গলকাব্যের প্রথম উন্মেষ তা আজ নিশ্চিত করে বলা কঠিন। এ কাব্যের রচনার মূলে খুবসম্ভব রয়েছে বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের আধিভৌতিক ভয়-ভাবনা। তারপর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের উত্থান-পতনের ইতিহাস। বাংলাদেশ নদীনালা, খালবিল, অরণ্যজলাভূমিতে ভরা। প্রাকৃতিক উপদ্রবও এদেশে লেগে আছে সর্বদা। ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগ, বাঘ-কুমীর-সর্প ইত্যাদি হিংস্র জন্তু, ওলাউঠা-বসন্ত ইত্যাদি ভয়ঙ্কর আধিব্যাধি এদেশের অধিবাসীকে প্রায়ই মৃত্যুকবলিত করত। এই সমস্ত প্রতিকারহীন অদৃশ্য উপদ্রবের কাছে তারা নিজেদের বড় অসহায়বোধ করতে লাগল। তারা ভীত হয়ে ভাবল, এ সমস্ত উপদ্রব ঘটানোর পিছনে নিশ্চয়ই অদ্ভুত ক্ষমতাধর কারোর হাত রয়েছে। এই অদ্ভুত ক্ষমতাধরটিকে তারা দেবতারূপে কল্পনা

করল। এক একজন দেবতা এক একটি উপদ্রব ঘটায়, তারা এই সিদ্ধান্ত করল। আর এই সিদ্ধান্ত-সূত্রেই সাপের ক্ষেত্রে সর্পদেবী মনসা, ঝড়ঝঞ্ঝার ক্ষেত্রে দেবী চণ্ডী, বাঘের ক্ষেত্রে দক্ষিণরায়, ওলাউঠা-বসন্তের ক্ষেত্রে দেবী শীতলা ইত্যাদি এরূপ নানা দেবদেবীর উদ্ভব হল। এই দেবদেবীদের সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই সব বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এই ভেবে এসব দেবদেবীর পূজার্চনা শুরু করল। এঁদের মাহাত্ম্য-কথা মুখে মুখে তৈরী করে গাইতে লাগল। দেবদেবীর মাহাত্ম্যগান যখন ব্যাপকতা পেল, বিষয়ের বিস্তৃতি ঘটল, মুখে মুখে ধারণ করে রাখা সম্ভব হল না, তখন এই মাহাত্ম্যকথা লিপিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল ধারণা। স্বভাবতই প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এ রচনা ছিল সংক্ষিপ্ত, অপূর্ণ। এই সংক্ষিপ্ত, অপূর্ণ মঙ্গলকথাগুলি 'ত্রয়োদশ শতাব্দীর যুগপ্লাবী প্রয়োজন প্রভাবে' একটি বিশেষ শিল্পরূপ পরিগ্রহ করে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত হয়ে উঠল, বিশ্বাস।

'ত্রয়োদশ শতাব্দীর যুগপ্লাবী প্রয়োজন প্রভাবে' কথাটিকে বিশদ করছি। বাংলার আদিম অধিবাসীরা অনার্য ছিল। পরে এদেশে আর্য-আগমন ঘটে এবং অনার্যেরা আর্যদের সঙ্গে মিশে যায়। এই মিশ্রণ ঘটলেও উভয়ের সংস্কৃতিগত, ধর্মগত ব্যবধান সম্পূর্ণ দূরীভূত হল না, ফলে একটি বিভেদের আড়াল থেকে গেল। উন্নততর আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির বাহকেরা বাংলার সমাজে সাধারণত উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং আদিবাসী অনার্যেরা নিম্নবর্ণের হিন্দুরূপে গণ্য হল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেবদেবী ও তাদের নিয়ে রচিত মাহাত্ম্যকথা অবজ্ঞার চোখে দেখত। তাদের চোখে শ্রদ্ধেয় ছিল পৌরাণিক দেবদেবী, সংস্কৃত পুরাণ, শাস্ত্রকাব্য ইত্যাদি। কিন্তু একটা রাষ্ট্রবিপ্লবে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়াতে বাংলাদেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হল। দেশশাসনের অধিকার তুর্কীদের হাতে চলে গেল। তুর্কী মুসলমানেরা শুধু রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হল না, তারা বাংলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনেও গুরুতর আঘাত হানল। উচ্চনীচের কোন বাছবিচার না করে হিন্দুদের মন্দির, দেববিগ্রহ ভাঙতে লাগল। এহেন অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন দেখা দিল। উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে তারা পরস্পরের কাছাকাছি এল। বিপর্যস্ত উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলতে লাগল। একটা সমন্বয়ের যুগ গড়ে উঠল। উপর তলার হিন্দুরা নীচের তলার হিন্দুদের পূজিত দেবদেবীকে স্বীকৃতি জানাল। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দুর আর্যসংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করার সুযোগ পেল। এভাবেই বহুতর আর্যেতর দেবতা চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি আর্যদেবদেবীদের পাশে আপনাদের স্থান করে নিল এবং কালক্রমে এরা আর্যদেবমণ্ডলের

সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। আদিতে চণ্ডী ছিলেন অনার্য ব্যাধজাতির উপাস্য কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি শিবজায়া উমার সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। সাপের দেবী ভয়ঙ্করী মনসাকে সমন্বয়ের যুগে শিবের কন্যা বলে প্রচার করা হল। অনার্য দেবতা ধর্মঠাকুর আর্যদেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে একীভূত হয়ে উঠলেন। নিম্নবর্ণের পূজিত দেবতারা উচ্চবর্ণের শ্রদ্ধালাভ করল। ফলে এই দেবদেবীর সংশ্লিষ্ট মঙ্গলকথাও আর অপাংক্তেয় হয়ে থাকল না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই মঙ্গলকথা পাঠ করতে লাগল, শুনতে লাগল। পূর্বেই বলেছি, তুর্কী আক্রমণের ফলে এদেশে জনজীবনে চরম বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল দেশব্যাপী অরাজকতা। মুসলমানদের অত্যাচারে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের বেশী দুর্দশা ঘটেছিল। টোল, পাঠশালা প্রভৃতি তাদের শিক্ষাসংস্কৃতির পীঠস্থানগুলি সমূলে ধ্বংস হচ্ছিল। দেশে তখন কোন প্রবল হিন্দু রাজশক্তি ছিল না যার কাছে নিপীড়িত, নিগৃহীত এরা আশ্রয় নিতে পারে। ভীত-সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ এমন এক শক্তিধরকে পেতে চাইল যার কাছে বরাভয় মিলতে পারে। এই বরাভয়দাতা দেবতা ছাড়া আর কেই বা হতে পারেন। মঙ্গলগাথাগুলিতে তারা এই দেবতার বরাভয় রূপের সন্ধান পেল। তারা দেখল—ভয়ঙ্কর ক্ষমতার অধিকারী এই দেবতারা সন্তুষ্ট হলে সামান্য ব্যাধেরও ধনে-মানে-জনে সমৃদ্ধি ঘটে আর ক্রুদ্ধ হলে অমিততেজার পতন ঘটে। এই দেবদেবীদের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করতে পারলেই তারা বিপদ থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, ধারণা হল। আর এই ধারণা হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দু কবিগণ অপূর্ণ, অপরিণত মঙ্গলগাথাগুলিকে শাস্ত্রপুরাণের প্রলেপে মার্জিত করে উদ্দিষ্ট দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে সবিশেষ উদ্যোগী হল। মেয়েলি ব্রতকথা-ছড়া, পাঁচালীরূপে যে মঙ্গলকথা বা মঙ্গলগান অপরিণত আকারে ছিল, তা এদের হাতে মঙ্গলকাব্যের পরিণত শিল্পরূপ পেয়ে অনন্যসুন্দর দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠল। এভাবেই মঙ্গলকাব্য রচনার সূচনা ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, ধারণা।

বৈশিষ্ট্য॥ মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এজাতীয় রচনা মোটামুটি চারটি অংশে বিভক্ত থাকে। প্রথম অংশ—বন্দনা। এতে হিন্দু মুসলমাননির্বিশেষে সকল শ্রেণীর দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। দ্বিতীয় অংশ—গ্রন্থ-রচনার কারণ বর্ণনা। প্রায় সব কবিই দেবতার স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা করার কথা বলেছেন। কবির আত্মপরিচয় এই অংশে থাকে। তৃতীয় অংশ—দেবখণ্ড। পৌরাণিক দেবকথার সঙ্গে লৌকিক দেবকথার যোগসূত্র বাঁধা হয়েছে এখানে। চতুর্থ অংশ—নরখণ্ড বা মূল কাহিনী বর্ণনা। এতে দেবতার পূজা প্রচারের জন্য কোন কোন দেবতা ও স্বর্গবাসীর শাপগ্রস্ত হয়ে নরলোকে জন্মগ্রহণের বর্ণনা আছে। তাছাড়া, রয়েছে নায়ক-নায়িকার প্রথাগত রূপ-বর্ণনা, কুলকামিনীর পতিনিন্দা, রন্ধন-বিবরণ,

নায়িকার বারমাসের সুখদুঃখের কথা 'বারমাস্যা', বিপন্ন নায়কের বর্ণানুক্রমে চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার স্তব 'চৌতিশা' ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যে সমাজচিত্র

মঙ্গলকাব্য দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক রচনা হলেও এর মধ্যে দেশকালজীবনের এক উজ্জ্বল আলেখ্য ধরা পড়েছে। মধ্য যুগের বাঙালী জাতির ইতিহাস লিখতে যিনি ইচ্ছা করবেন, মঙ্গলকাব্যের পাতায় তিনি প্রভূত উপকরণ পাবেন। বাঙালার আহার-বিহার, হাটবাজার, পোষাক-অলঙ্কার, শিক্ষাদীক্ষা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সামাজিক আচার-আচরণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন কবিরা। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস সাধারণ মানুষের ইতিহাস—আর এই ইতিহাসমূল্যেই মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি ধারা—(১) মনসামঙ্গল (২) চণ্ডীমঙ্গল ও (৩) ধর্মমঙ্গল। সব কটি ধারাই মধ্য যুগের অন্তর্ভুক্ত হলেও এগুলির উদ্ভবকালের অল্পবিস্তর ব্যবধান থাকায় পৃথক পৃথকভাবে সমাজচিত্র লিপিবদ্ধ করা হল।

মনসামঙ্গলে সমাজচিত্র ॥ মনসামঙ্গলকাব্যে মধ্য যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের বহু বিচিত্র ও বাস্তব উপাদান বিকীর্ণ রয়েছে। মনসামঙ্গল-কাব্যের রচনা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু। এসময়ে বাংলাদেশে হিন্দুরাজাদের গৌরব অস্তমিত। মুসলমান রাজশক্তি দেশের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত। সমাজে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যাদর্শই প্রবল। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে শৈবধর্মেরই আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। সমাজের নিম্নস্তরে মনসাপূজার প্রচলন শুরু হয় এবং তা পরে সমগ্র সমাজে প্রসার লাভ করে। সমাজে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। শ্রমিক-কৃষকেরাই শূদ্র বলে গণ্য হত। বণিকেরাই ছিল সমাজের অন্যতম অভিজাতশ্রেণী। সম্ভবত বাঙালীর বাণিজ্যযাত্রা একাদশ-দ্বাদশ শতকে পরিত্যক্ত হয়েছিল। মনসামঙ্গলকাব্যে বাণিজ্য-যাত্রার যে বর্ণনা মেলে তা অতীতের স্মৃতিচারণমাত্র।

হিন্দুর সামাজিক নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ এতে মেলে। সাধভক্ষণ থেকে আরম্ভ করে অন্নপ্রাশন, বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারের বর্ণনা অতি নিখুঁতভাবে চিত্রিত। সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিবাহ ব্যাপারে পিতামাতার নির্বাচনই ছিল চূড়ান্ত। পাত্রপাত্রীর রূপগুণ ছাড়াও বংশকৌলীন্য বিশেষ বিবেচ্য ছিল। বিবাহ-অনুষ্ঠানে স্ত্রী-আচারের প্রাধান্য ছিল। নববধূর বাসর-রাত্রি জাগরণের প্রথা বিশেষ উল্লেখ্য। সর্প-দংশনে মৃত ব্যক্তিকে পোড়ানো হত না—কলার ভেলায় করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। সেকালে বাংলাদেশে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, ধারণা। চাঁদের প্রথম ছয় পুত্র মারা যাওয়ার পর তাদের বধূরা

সহমরণ করেনি, এ জন্য চাঁদসদাগরকে অনেক গঞ্জনা শুনতে হয়েছিল। নৌ-যাত্রাকালে পূজার্চনার প্রথা প্রচলিত ছিল। যাত্রাকালে দিনক্ষণ বিচার করা হত। মেয়েরা নানারকম বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করত। পুরুষেরা অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করত। রন্ধনের যে বিশদ বর্ণনা আছে, তা থেকে মধ্য যুগের বাঙালীরা খুব ভোজনরসিক ছিলেন, ধারণা হয়। সমাজে পুরুষ-প্রাধান্যই বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে নারীর স্বাধীনতা তো দূরের কথা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও স্বীকৃত ছিল না। সনকা মনসা-পূজার আয়োজন করেছে কিন্তু চাঁদসদাগর মনসার মঙ্গলঘট ভেঙে দিয়েছেন হেঁতালের লাঠির ঘায়ে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর স্বতন্ত্র বিশ্বাসকে সেদিনের সমাজ স্বীকৃতি দেয়নি। কোন দুর্ঘটনায় স্বামীর অকাল-মৃত্যুর জন্য নারীকেই দায়ী করা হত। লখিন্দরের মৃত্যুর জন্য বেহুলাকেই দোষারোপ করেছিলেন সনকা।

অন্ধ কুসংস্কার, প্রথানুগতা, দৈবনির্ভরতা সেকালের সমাজমানসকে যে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, মনসামঙ্গলে অঙ্কিত সমাজচিত্র থেকে তা ধরা পড়ে।

চণ্ডীমঙ্গলে সমাজচিত্র॥ সাহিত্য দেশকাল-সমাজের দর্পণ। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে তাই বাংলাদেশ ও বাঙালীজীবন চমৎকার বিশ্বস্ততায় প্রতিফলিত হয়েছে। মনসামঙ্গল-কাব্যে ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্রের সাদৃশ্য বর্তমান, কারণ উভয়কাব্যের প্রেক্ষাপটে যে সমাজ রয়েছে তা, বলা বাহুল্য, মধ্য যুগের বাঙালীসমাজ। তবে মনসামঙ্গলের উদ্ভব পূর্বে হওয়ায় ঐ কাব্যের সমাজ দু-এক শতাব্দীর পূর্ববর্তী এবং চণ্ডীমঙ্গলের সমাজ দু-এক শতাব্দীর পরবর্তী।

বহিরাগত মুসলমান রাজশাসন বাঙালীর জীবনাকাশকে যে দুর্যোগপূর্ণ করে তুলেছিল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রয়েছে তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। অত্যাচারী শাসকের তীব্র উৎপীড়নে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সাতপুরুষের ভিটা ছেড়ে লোকজন পালাতে বাধ্য হয়েছিল। রাজকর্মচারীরা ছিল অসাধু, ঘুষখোর। রাজশক্তির কাছে সুবিচার পাবার কোন আশা ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে দৈবনির্ভরতা দেখা দিয়েছিল এবং সমাজ-চরিত্রকে তা আরো করে তুলেছিল দুর্বল। শৈব ও শাক্তমতের দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে তীব্রতা হারিয়েছিল বটে কিন্তু শাক্তমতেরই প্রাধান্য লক্ষিত হতে থাকে। আশ্বিন মাসে ঘরে ঘরে ছাগমেষ বলি দিয়ে দেবী দুর্গার পূজা তার স্পষ্ট প্রমাণ।

সেকালে বৃত্তি অনুযায়ী সামাজিক বিভাগ ছিল। গুজরাট নগরপত্তনের সময় তার পরিচয় পাই। লেখাপড়ার চর্চা, পুরোহিতবৃত্তি, ঘটকালি, শিক্ষকতা প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তি ছিল ব্রাহ্মণ-সমাজের। তবে ব্রাহ্মণেরা জমিজমারও কাজ করত। বৈদ্য-সমাজ

চিকিৎসাবৃত্তির দ্বারা করত জীবিকানির্বাহ। কায়স্থ-সমাজ নানাবিধ হিসাব-রক্ষার কাজে সহায়ক ছিল। নানাবিধ শ্রমজীবী শ্রেণী হলকর্ষণ, মৎস্যশিকার, তৈলপ্রস্তুত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। ডোমেরা সৈন্যহিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল আর ব্যাধেরা ছিল শিকার-পটু। হাটেবাজারে পণ্যের ক্রয়বিক্রয় অনুষ্ঠিত হত। বিনিময় প্রথায় নয়, টাকাকড়ি দিয়েই লোকে জিনিসপত্র কিনত। হাতীঘোড়া তো বিক্রয় হতই, কোন কোন হাটে ক্রীতদাস কেনাবেচা হত। মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙিয়ে দিত পোদ্দার। জিনিস বাঁধা দিয়ে সুদে টাকা মিলত। জমির মাপ ও উৎপাদিত শস্যের হিসেবে ধার্য হত খাজনা। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে খাজনা মকুব করা, এমনকি রাজার পক্ষ থেকে এককালীন সাহায্য করার রীতিও প্রচলিত ছিল। বুলান মণ্ডলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কালকেতুর উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। মুসলমান রাজশক্তি অত্যাচারী হলেও সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ ছিল—প্রমাণ, কালকেতু-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে মুসলমান প্রজার নিরাপদে বসতি-নির্মাণ ও ধর্মাচরণ।

ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যে ভোগবিলাস, অসংযম ও অমিতাচার ছিল। ধনপতির পায়রা ওড়ানো ও বহুবিবাহ তার নিদর্শন। বহুবিবাহের জন্য সতীনদের মধ্যে কলহ লেগে থাকত। উচ্চবর্ণের নারীদের অবরোধপ্রথা ছিল। খুল্লনা বনে ছাগল চরিয়েছিল বলে সমাজপতিরা ধনপতিকে করেছিল একঘরে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর নারীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা তত কঠোর ছিল না—তাই ফুল্লরাকে পসরা নিয়ে ঘরে ঘরে মাংস বিক্রয় করতে দেখি। নারীকে তার সতীত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি নানা পরীক্ষা দিতে হত সেকালে।

ঘটকের দ্বারা সম্বন্ধ-নির্ণয়, কন্যাপণ ও বরযৌতুক, বরযাত্রীসহ বরের বিবাহ গমন, স্ত্রী-আচার ইত্যাদি বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলে মেলে। স্ত্রী-পুরুষে উভয়ে স্বর্ণ-অলঙ্কার পরত। ধুতি এবং চাদর ছিল বাঙালী পুরুষের প্রচলিত বেশ। মেয়েরা মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখত এবং কেশবন্ধন একটা উচ্চস্তরের শিল্পকর্ম ছিল।

বণিকেরা ছিল সমাজের মধ্যমণি। ব্যাধ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। বছরের কয়েকমাস তাদের আধপেটা অন্নেরও সংস্থান হত না। অপরদিকে ধনীপরিবারের ছিল অতুল প্রাচুর্য। তখনকার বাংলাদেশে এই ছিল অর্থনৈতিক চিত্র।

ধর্মমঙ্গলে সমাজচিত্র॥ ধর্মমঙ্গলকাব্য ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন না। সুতরাং এই কাব্যে মধ্য যুগের বাংলাদেশের যে সমাজচিত্র পাওয়া যাবে তা ষোড়শ শতাব্দীর ও তৎপরবর্তীকালের বলে গ্রহণ করতে

হবে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে নানা অনৈসর্গিক ও উদ্ভট ঘটনার সমাবেশ থাকলেও এতে সমসাময়িক ইতিহাস, সামাজিক অবস্থা, রীতিনীতিসংস্কার ইত্যাদি বিশ্বস্তভাবে ধরা পড়েছে।

নবজাতকের জন্ম থেকে অন্নপ্রাশন পর্যন্ত নানাপ্রকার সংস্কারবিধি ছিল। বিবাহে নানা স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হত। কন্যাকে নানাপ্রকার যৌতুক ও দক্ষিণা দেওয়া হত। নানাপ্রকার লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার মানা হত। মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁকে বিশেষ আস্থা ছিল। পুত্রকামনায় নানা অনুষ্ঠান ও ব্রত মানত করা হত। সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় কর্ণসেনের ছয় পুত্রের মৃত্যুতে—'চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা'। যাত্রা-কালে নানাপ্রকার লক্ষণ দেখে যাত্রা শুভ কি অশুভ তা নির্ণীত হত।

লাউসেনের বিদ্যাচর্চায় তৎকালীন বিদ্যাশিক্ষার বর্ণনা মেলে। প্রথমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ, পরে যুক্তাক্ষর ও বানান-শিক্ষার প্রথা ছিল। ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রাদিও পড়ান হত। মেয়েরা পিঠে ঝাঁপা, গলায় গজমোতি হার, কানে রত্নময় অলঙ্কার, নাকে বেসর, হাতে কঙ্কণ ও শঙ্খ এবং আঙুলে আংটি ইত্যাদি অলঙ্কার পরত। পুরুষেরাও নানাবিধ অলঙ্কার পরত। যুদ্ধকালে দামামা, দগড়, শিঙ্গা, রণদুন্দুভি, ঠমক, জগঝম্প, মাদল ইত্যাদি বাজনা ব্যবহৃত হত। যুদ্ধযাত্রা এবং সৈনিকদের আচার-আচরণের একটা চমৎকার পরিচয় ধর্মমঙ্গলকাব্যে মেলে। বন্দুক এবং কামানের ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘনরাম যখন তাঁর কাব্য রচনা করেন, তখন মুর্শীদকুলী খান বাংলার দেওয়ান। তাঁর আমলে বাংলাদেশে ভূমিসংস্কার ও করধার্যের নতুন পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল। পাহারাদার নিযুক্ত করে তাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে স্থানীয় শাসকেরা প্রজাদের উপর নানাধরণের অত্যাচার করত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, ধীবর, সিউলি, ছুতার, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির লোক নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করত। ডোমেরা খুবই রণপটু ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ছিল। ধর্মমঙ্গলকাব্যে বাঙালীর বীর্যবত্তার যে পরিচয় মেলে, তা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে বিরল। ধর্মমঙ্গলকাব্য, প্রকৃতপক্ষে, রাঢ়বঙ্গের জনপদজীবনের মুকুরস্বরূপ।

মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা

সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্যকথা যে কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তাই মনসামঙ্গল কাব্য। এতে সর্পদেবী মনসা কিভাবে মর্ত্যে নিজের পূজা প্রচার করলেন, তার পরিচয় মেলে। মনসাপূজার সঙ্গে সর্পপূজার ইতিহাস জড়িত। সর্পপূজা ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন। বাংলাদেশে সর্পপূজার প্রচলন কিভাবে শুরু হল, তা বলা কঠিন। পণ্ডিতদের অনুমান, বাংলাদেশে দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর যে মানুষেরা বাস করত, তাদের দ্বারাই এদেশে সর্প-পূজার প্রচলন হয়।

'মনসা' নামের উদ্ভব নিয়ে পণ্ডিতেরা কোন মতৈক্যে আসতে পারেননি। একমতে, দক্ষিণ ভারতের 'মঞ্চাম্মা' নাম্নী সর্পদেবী থেকে 'মনসা' নামের উদ্ভব। অন্যমতে, শিবের মানসকন্যা বলেই এই দেবীর নাম মনসা। দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদিতে মনসার উল্লেখ আছে। অবশ্য এসব পুরাণ অর্বাচীন। বাংলাদেশে দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে সর্পভূষণা মনসার প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে। যাই হোক, মনসা যে মূলে আর্যেতর দেবতা ছিলেন এবং পরে আর্যদেবমণ্ডলে স্থান পেয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনসামঙ্গলের মূল কাহিনী পুরাণাশ্রয়ী নয়, লোকমুখেই এ কাহিনীর উদ্ভব।

কাহিনী॥ শিবের মনে জাগল সৃষ্টিবাসনা। তার ফলে কালিদহের পুষ্পবনে জন্ম হল এক সুন্দরী কন্যার। মন থেকে সৃষ্ট বলেই শিব তাঁর নাম 'মনসা' রাখলেন। পদ্মপাতার উপর জন্ম হয়েছিল বলে আর একটি নাম হল পদ্মা বা পদ্মাবতী। জন্মের পরে মনসা পাতালে নাগলোকে আশ্রয় পেলেন এবং সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন। শিব একদিন মনসাকে কৈলাসে নিয়ে এলেন। শিবের পত্নী চণ্ডীর সঙ্গে মনসার বিবাদ বাধল। চণ্ডী খোঁচা দিয়ে মনসার একটি চোখ নষ্ট করে দিলেন। তার ফলে সেদিন থেকে মনসার আর এক নাম হল 'কাণি'। পত্নীকে শিব কিছু বলতে সাহস না পেয়ে নিরুপায় হয়ে মেয়ে মনসাকে সিজুয়া পর্বতে নিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে এলেন। মেয়ের কাছ থেকে চলে আসার কালে শিবের চোখ থেকে ঝরে পড়া অশ্রুতে একটি মেয়ের জন্ম হল। নেত্রজলে জন্ম বলেই এই মেয়ের নাম হল নেতা বা নেত্রবতী। নেতা মনসার সখী ও পরিচারিকা-রূপে নিযুক্ত হল। এর পর শিব জরুৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ দিলেন।

পুত্র আস্তীকের জন্ম হবার আগেই জরৎকারু মনসাকে ছেড়ে তপস্যায় চলে গেলেন। স্বামী-পরিত্যক্তা মনসা নেতার উপদেশে মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচারের জন্য উদ্যোগী হলেন। একদিন দেখলেন, একদল রাখাল ছেলে মাঠে গোচারণ করছে। মনসা বুড়ী সেজে তাদের কাছে গিয়ে দুধ চাইলেন। তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল মনসাকে। মনসা শাপ দিলেন। তাদের সব গরু জল খেতে গিয়ে পাঁকে আটকে গেল। তখন রাখাল

ছেলেরা মনসাকে দেবতা জেনে স্তুতি করতে লাগল। মনসা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন ও তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা করতে বললেন। রাখাল ছেলেরা মনসার পূজা করল। এরপর মনসা মর্ত্যে চাঁদসদাগরের পূজা পাবার জন্য উদ্যোগী হলেন। চাঁদ একে শিবভক্ত তায় সাপের মহাশত্রু। এহেন চাঁদের কাছ থেকে মনসার পূজা পাওয়া বড়ই বিষম কাজ। মনসা চাঁদকে অনুনয় বিনয় করলে চাঁদ বললেন—

যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পূজিব পুনি চেং মুড়ি কাণি॥

এদিকে সখী নেতা চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকাকে গোপনে মনসাপূজা শিখিয়ে দিয়ে এল। চাঁদ নিত্য শিব-পূজা করেন আর এদিকে স্ত্রী সনকা গোপনে করেন মনসাদেবীর পূজা। একদিন চাঁদ জানতে পেরে লাথি মেরে মনসার ঘট ভেঙ্গে দিলেন। মনসা এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। চাঁদের সুন্দর বাগানবাড়ী ধ্বংস করলেন। চাঁদের ছয় পুত্রকে মেরে ফেললেন। কিন্তু চাঁদ শিবদত্ত মহাজ্ঞান সাহায্যে সব কিছুই বাঁচিয়ে তুললেন। তখন মনসা কৌশল করে চাঁদের মহাজ্ঞান চুরি করে নিলেন। আহার্য বস্তুতে বিষ মাখিয়ে চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণ বিনাশ করলেন। মহাজ্ঞান না থাকায় চাঁদ এবার ছেলেদের বাঁচাতে পারলেন না।

পুত্রশোক ভুলবার জন্য চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে চাঁদ বাণিজ্যে বার হলেন। বার বছর পরে বাণিজ্য শেষ করে ধনরত্ন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিলেন তখন মনসা সমুদ্রে ঝড় তুফান উঠিয়ে ডুবিয়ে দিলেন সব ডিঙ্গা। চাঁদের সঙ্গী লোকজন, ধনরত্ন সব অতলে তলিয়ে গেল। চাঁদ মরে গেলে পূজাপ্রচার হবে না বলে চাঁদকে বাঁচানোর জন্য মনসা একটি পদ্মফুল ছুঁড়ে দিলেন। চাঁদ পদ্মফুলটি হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েও ধরলেন না। মনসার আর এক নাম পদ্মা। 'পদ্মা' আর 'পদ্ম' শব্দের সাদৃশ্যই চাঁদকে ক্রুদ্ধ করল। চাঁদ জলে ভাসতে লাগলেন। মনসা নিজের স্বার্থে বাঁচিয়ে রাখলেন চাঁদকে। অনেক লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করার পর হৃতসর্বস্ব চাঁদ দেশে ফিরলেন। গৃহে ফিরে পুত্র লখিন্দরের মুখ দেখে সব দুঃখ ভুললেন। সায়বেণের কন্যা বেহুলার সঙ্গে দিলেন লখিন্দরের বিয়ে। বিবাহবাসরে লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হবে জেনে সাঁতালি পর্বতে এক নিশ্ছিদ্র লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করলেন। কিন্তু এই বাসর-ঘরের নির্মাতা দেবী মনসার ভয়ে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র রেখে দিল। মনসার পাঠানো কালনাগিনী বাসররাতে এই ছিদ্রপথে ঢুকে দংশন করল লখিন্দরকে। সর্পদষ্ট স্বামীকে কোলে তুলে নিলেন বেহুলা। বেহুলার কোলে মাথা রেখে মারা গেলেন লখিন্দর। সাপেকাটা মড়া জলে ভাসানো রীতি। তাই লখিন্দরকে কলার মান্দাসে ভাসানোর আয়োজন হল। মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে আনবেন এই সঙ্কল্প করে বেহুলাও মান্দাসে চড়ে বসলেন।

মা, ভাই সকলের করুণ মিনতি উপেক্ষা করে গাঙুরের জলে ভেসে চললেন বেহুলা।

পথে নানা প্রলোভন ও বিপদকে তুচ্ছ করে ছয়মাস পরে বেহুলা নেতা ধোপানীর সহায়তায় দেবলোকে পৌঁছলেন। সেখানে শিবকে নৃত্যে দক্ষতা দেখিয়ে তুষ্ট করলেন। শিব মনসাকে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। বেহুলা তার শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসার পূজা করাবে এই সর্তে মনসা লখিন্দর ও তার ছয় ভাইয়ের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। স্বামী, ছয় ভাশুর নিয়ে দেশে ফিরলেন বেহুলা। খবর পেয়ে চাঁদ সদাগর নদীতীরে হাজির হলেন। গররাজি হলেও শেষ পর্যন্ত বেহুলার করুণ মুখ চেয়ে বামহাতে পূজা করলেন মনসার। মনসা সানন্দে তাই গ্রহণ করলেন।

এভাবে দেবী মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হল। আর এদিকে বেহুলা ও লখিন্দর (আসলে শাপভ্রষ্ট ঊষা ও অনিরুদ্ধ) মনসার পূজা প্রচার করে সশরীরে স্বর্গে ফিরে গেলেন। এই হল মনসামঙ্গলকাব্যের কথাবস্তু।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলকাব্য সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলার নানা অঞ্চলে, এমনকি বাংলার বাইরেও এই কাহিনীর পরিচয় মেলে। এ কাহিনীর জনপ্রিয়তার মূলে করুণরসাত্মক কথাবস্তুরই আবেদন সমধিক, ধারণা। মনসামঙ্গলকাব্য করুণ রসের আকর। সদ্যোবিবাহিতা নববধূর জীবনের প্রথম মধুলগ্নে অকালবৈধব্যের যে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ নেমে এল, তারই রূঢ় নির্মমতা আমাদের স্তম্ভিত করে তোলে। এই মর্মভেদ কাহিনীর মধ্যে ভাগ্যতাড়িত মানবজীবনের যে করুণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, তাই-ই এ কাহিনীর জনহৃদয়হরণের হেতু, অনুমান। মনসামঙ্গলকাব্য বাঙালীর অন্যতম প্রধান জাতীয় কাব্য। চাঁদ সদাগরের দুর্দমনীয় উদাত্ত পৌরুষ মহিমা আর বেহুলার ত্যাগতিতিক্ষাপূত নারীত্বমহিমা কবিরা যেভাবে নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সেযুগের পটভূমিকায় অনন্যরহিত।

চাঁদ সদাগর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অপরাজেয় পৌরুষের প্রতীক, দুঃখবরণের কঠোরতম তপস্যাতেও চাঁদ বিজয়ী। মনসার অকথ্য নির্যাতন, বহুদিবসের অনাহার, সাতপুত্রের শোক, পত্নীর অনুনয়-বিনয় কিছুই তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তাকে টলাতে পারেনি। সমুদ্রে তাঁর নৌকাডুবি হওয়ায় জলে মজ্জমান অবস্থায় যখন মৃত্যু আসন্ন, সে সময়ও চাঁদ পৌরুষ হারাননি। পদ্মা-মনসার নামসম্পৃক্ত পদ্মফুল অবলম্বনে প্রাণবাঁচানো অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাই তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়েছে। এরূপ মহৎ গম্ভীর সৌন্দর্যময় পৌরুষপূর্ণ চরিত্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। শেষকালে বেহুলার অনুরোধে চাঁদ মনসাপূজা করলেও এখানে দেবতার কাছে মানুষের পরাজয়ের পরিচয় পাই না। এতে পাই দুঃখিনী পুত্রবধূর নিকট স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ের নির্বিচার আত্মসমর্পণ। চাঁদের এ পরাজয় মানুষের কাছে মানুষের পরাজয়। চাঁদ সদাগরের চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে কবিদের

এই কৃতিত্বই আমাদের সর্বাধিক মুগ্ধ করে।

মনসামঙ্গলকাব্যের বেহুলা চরিত্র এক অসামান্য সৃষ্টি। কেবল মনসামঙ্গলকাব্যের নয়, মঙ্গলকাব্যগুলির নারীচরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধ করি, বেহুলা। ভারতীয় পুরাণের সীতাসাবিত্রীর পাশেই বাঙালী ঘরের বধূ বেহুলার স্থান। বেহুলা একাধারে রামায়ণের সীতা ও মহাভারতের সাবিত্রী—দুঃখসহনশীলতায় সে সীতা এবং মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করার শক্তিতে সে সাবিত্রী। বেহুলা চরিত্রে বাঙালী নারীর অপরিসীম দুঃখসহনশীলতা ও মৃদুতার সঙ্গে নির্ভীক তেজস্বিতা মিশেছে। বিবাহের রাত্রিতে সর্পদংশনে লখিন্দর প্রাণত্যাগ করলে সনকার ভর্ৎসনায় বেহুলা বলে—

অভাগিনী বেহুলারে মাতা কেন কর রোষ।
কর্মদোষে মইল প্রভু নহে মোর দোষ ॥

'কর্মদোষে প্রভুর মৃত্যু হয়েছে' একথা বললেও স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য মৃত স্বামীকে কোলে করে এক অনির্দিষ্ট যাত্রায় গাঙুরের স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে বেহুলার অপরিসীম সাহসিকতা ও পতিপ্রাণতার পরিচয় মেলে। ভ্রাতারা সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে, ঘরে ফিরতে অনুরোধ করে—বেহুলা তাতে কর্ণপাত করে না। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামের শপথে অবিচলা বেহুলার এই বজ্রকঠোর দৃঢ়তা উজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর।

কবিবৃন্দ

এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক মনসামঙ্গলের কবির নাম পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপলাই, দ্বিজ বংশীদাস ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সমধিক প্রসিদ্ধ।

কানা হরিদত্ত

কানা হরি দত্ত মনসামঙ্গলের আদি কবি। বিজয়গুপ্ত তাঁর পদ্মাপুরাণে আদি কবি হিসেবে কানা হরি দত্তের উল্লেখ করেছেন। হরি দত্তের সম্পূর্ণ পুথি মেলেনি। তাঁর ভণিতাযুক্ত যে খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে, তাতে পদ্মার সর্প-সজ্জার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। খুবসম্ভব চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল।

বিজয় গুপ্ত

কাব্যকথা ॥ বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে জনপ্রিয়। বরিশাল জেলার আধুনিক গৈলা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। কবির পিতার নাম সনাতন এবং মাতার নাম রুক্মিণী, বৈদ্যবংশে কবির জন্ম। কবির কাব্যের নাম পদ্মাপুরাণ। তাঁর কাব্যে হোসেন শাহের উল্লেখ থাকায় হোসেন শাহের সিংহাসন লাভের পর (১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) কাব্যটি রচিত হয়, ধারণা।

কাব্যকথা॥ বিজয় গুপ্ত সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনায় কবিত্বের চেয়ে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ পেয়েছে বেশী। মনসামঙ্গলের মূল সুর করুণরসাত্মক। করুণরস সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্ত ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু হাস্য ও কৌতুকরস সৃষ্টিতে কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যেমন, তাঁর গোদার বর্ণনাটি হাস্যরসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

সকল গুণ আছে গোদার দোষ একখানি।
দারুণ জর পাইলে ছাড়ে ভাত-পানি॥

অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর হাস্যরস শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

ছন্দোনির্মাণে বিজয় গুপ্তের নৈপুণ্যের প্রশংসা করা যেতে পারে। যেমন, শিবের সম্পর্কে ক্রোধাবিষ্টা চণ্ডীর উক্তি থেকে তাঁর ছন্দের উপর দখলের পরিচয় পাই—

প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি॥

পয়ার-ত্রিপদী প্লাবিত সে যুগের বাংলা কাব্যে এমন ছড়ার ছন্দের প্রয়োগ বিজয় গুপ্তের ছন্দে বৈচিত্র্যসৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

বিজয় গুপ্তের সর্বাধিক কৃতিত্ব বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে ও বলিষ্ঠ চরিত্র-চিত্রণে। তাঁর কাব্যে মধ্য যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়।

বিজয় গুপ্তের চাঁদ বলিষ্ঠ পৌরুষে উজ্জ্বল। তবে জীবনসংগ্রামে অপরাজেয় পুরুষকারের প্রতিমূর্তি চাঁদের চরিত্রমহিমা কবি কাব্যের সমাপ্তিতে একটু ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন। চাঁদের মহৎ মর্যাদাকে দৈবের পায়ে বলি দিয়েছেন। বেহুলার স্নেহে বশীভূত চাঁদ অঙ্গীকার করলেন যে, পিছন ফিরে বাম হাতে দেবীর পূজা করবেন। এ পর্যন্ত চাঁদ-চরিত্রে সঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু কাব্যের উপসংহারে দেখতে পাই, চাঁদ ষোড়শোপচারে পূজা সাজিয়ে যোড়হাতে মনসার সামনে দাঁড়িয়ে স্তব করেছেন। চাঁদের এই দৈন্য আমাদের পীড়িত করে। বেহুলা চরিত্রটিকে সমস্ত মাধুর্য ও পবিত্রতায় ভরে দিয়ে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। মাতৃহৃদয়ের বেদনার প্রতিচ্ছবিরূপে সনকার চরিত্রটি সুন্দর। কবি অনন্য দক্ষতা দেখিয়েছেন মনসাচরিত্রের সূক্ষ্ম রূপায়ণে। কবিচিত্তের করুণা ও সহানুভূতির আলোকে মনসাচরিত্রকে আলোকিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন এখানে। কবি দেখিয়েছেন, বাল্যে স্নেহহীনতা ও বিমাতার অত্যাচার এবং যৌবনে স্বামী-প্রেমের অভাবই মনসাকে স্নেহদয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর করে তুলেছে। বিজয় গুপ্তের মনসা আক্ষেপ করেছেন—

জনমদুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥···

কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল ॥

জীবনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতাই, অপ্রাপ্তির বেদনাই মনসাকে ক্ষিপ্ত করে ন্যায়-অন্যায়-বিবেকবোধহীন, হিংস্র ও নিষ্করুণ করে তুলেছে। নিজে যা পাননি, তাই অন্যকে দিতেও তা চাননি। তাই তাঁর উদ্যত ক্রোধ মাতার স্নেহ, পিতার আলিঙ্গন, পত্নীর প্রেমাকূতিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যই সদাজাগ্রত। শিবের চরিত্র-চিত্রণেও কবির কৃতিত্ব লক্ষণীয়। বিজয় গুপ্তের শিব শিথিলচরিত্র দরিদ্র গৃহস্থ। অল্প স্তুতিতেই তিনি সন্তুষ্ট হন, আবার তুচ্ছ ব্যাপারেই প্রলয় কাণ্ড বাধান। শিবের আনন্দ এবং বেদনার মাত্রা এবং প্রকাশভঙ্গীর শিশুসুলভতা চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বিজয় গুপ্ত যে পরিমাণে জনপ্রিয় ছিলেন, সে পরিমাণে হয়তো কাব্যগুণের অধিকারী ছিলেন না। তবুও মনসামঙ্গলকাব্যধারায় তিনি যে একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী কবি, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

নারায়ণ দেব

কবিকথা ॥ নারায়ন দেব মনসামঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি। কবির কাব্যের নাম পদ্মাপুরাণ। কবির পিতার নাম নরসিংহ, মাতার নাম রুক্মিণী। কবির পূর্বপুরুষের আদিবাস রাঢ়দেশে ছিল। কবির বৃদ্ধ পিতামহ উদ্ধারণ দেব রাঢ়দেশ ছেড়ে ময়মনসিংহ গ্রামের বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেই থেকে তাঁরা পূর্ববঙ্গবাসী। নারায়ণ দেবের কাব্যে ভণিতা 'সুকবিবল্লভ নারায়ন দেব' পাওয়া যায়। এ থেকে কেউ কেউ মনে করেন, সুকবিবল্লভ ও নারায়ন দেব দুজনে পৃথক কবি। এমন ধারণার কোন সঙ্গত কারণ নেই। তাঁর পদ্মাপুরাণের ভণিতার ধরন থেকে 'সুকবিবল্লভ' কবিকে দেওয়া উপাধি বলেই মনে হয়।

নারায়ণ দেবের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। অনুমানের উপর নির্ভর করে কবির আবির্ভাবকাল কেউ ত্রয়োদশ শতাব্দী, কেউ বা চতুর্দশ শতাব্দী মন্তব্য করেছেন। নারায়ন দেবের বংশধরদের কাছে রক্ষিত 'বংশলতিকা' থেকে মনে হয়, কবি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

কাব্যকথা ॥ নারায়ন দেবের রচনা যা মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়, তা সুবিন্যস্ত ও সুগ্রথিত এবং পূর্ণাঙ্গও নয়। এজন্য তাঁর কবিপ্রতিভার বিচার দুঃসাধ্য। তবুও প্রাপ্ত রচনাবলম্বনে মনসামঙ্গলকাব্যধারায় তাঁর স্থান নির্ণয় করা চলে। নারায়ন দেব সংস্কৃত কাব্য, শাস্ত্রপুরাণাদিতে যে সুপণ্ডিত ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর কাব্যেই আছে। মহাভারত, শৈবপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি থেকে তাঁর দেবখণ্ডের কাহিনী সংগৃহীত। লক্ষণীয়, তাঁর এই পাণ্ডিত্য স্বতোৎসারিত কবিত্বের ক্ষেত্রে কোন বাধা

সৃষ্টি করেনি। 'চিত্তে সাত পাঁচ করে মুখে নাহি সরে' অথবা 'কাকের বাসাতে কোকিল থাকে কত কাল' ইত্যাদি তাঁর স্বাভাবিক বাক্‌রীতির নিদর্শন। করুণরস সৃষ্টিতে নারায়ণ দেবের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। সর্পদংশনের জ্বালায় যন্ত্রণাকাতর লখিন্দরের—

ওঠ ওঠ প্রাণপ্রিয় কত নিদ্রা যাও।
কালনাগ খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে॥
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ডব্রতকালে॥

—ইত্যাদি এই আর্তির মধ্যে লখিন্দরের মৃত্যুযন্ত্রণা এবং বেহুলার আসন্ন সর্বনাশের দুঃখবেদনা সমভাবে মর্মস্পর্শী বাণীরূপ পেয়েছে। রঙ্গব্যঙ্গ কৌতুকরস পরিবেশনেও তাঁর দক্ষতা বিস্ময়কর। যেমন, বণিক সম্বন্ধে তাঁর বক্রোক্তি চমৎকার বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় দেয়—

কাক হন্তে সেয়ানা জে বাণিআ ছাওয়াল।
বাণিআ হন্তে ধুত্ত জেই তারে দেই পান॥

নারায়ণ দেবের কাব্যেও অশ্লীলতা আছে। তবে সে যুগের অন্যান্য কাব্যে যেরকম অশ্লীলতার বাড়াবাড়ি দেখা যায়, নারায়ণ দেবে তা নেই। প্রাচীন বাংলার গ্রাম-দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না-ভরা জীবনের নিখুঁত পরিচয় তাঁর কাব্যে বিধৃত রয়েছে। বাণিজ্যযাত্রা-প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকলেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। কবির দৃষ্টি সর্বত্র সতর্ক; অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ও দৃশ্য মানবভুবন থেকে তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। বেহুলার বিয়েতে তারকারাণী রন্ধনকার্যে নিযুক্তা। কবি অলক্ষ্যে রান্নাঘরে গিয়ে নিরামিষ ও আমিষ রান্নার প্রণালীসহ পরপর ব্যঞ্জনের তালিকা দিয়ে চলেছেন। শুধু তাই নয় 'রন্ধন রাধে তারকা কানে লড়ে সোনা'— সুন্দরী পাচিকার কর্ণভূষণ-হিন্দোলের সৌন্দর্যটুকুও কবির চোখ এড়ায়নি। এ ধরণের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় তাঁর রচনায় অনেক পাওয়া যায়।

প্রচলিত আখ্যানে নতুনত্ব দেখাতে না পারলেও চরিত্রচিত্রণে নারায়ণ দেব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। প্রথার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে নারায়ণ দেবের চাঁদও মনসার কাছে মাথা নুইয়েছেন। তবু হারানো সম্পদ নিয়ে বেহুলার প্রত্যাগমন থেকে শুরু করে মনসাপূজার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চাঁদের চিত্তলোকের যে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, তা তাঁর উন্নততর শিল্পকৃতির পরিচায়ক। চাঁদ বলেছে—

কি করিব পুত্রে মোর কি করিব ধনে।

না পূজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে ॥

মনুষ্যত্বই যদি হারাতে হয়, সম্পদ দিয়ে কি হবে। কি হবে পুত্র দিয়ে ধূলায় 'মান' লুটিয়ে। চাঁদের দুর্মর কণ্ঠস্বর একমাত্র নারায়ণ দেবেই শ্রুত হয়।

নারায়ণ দেবের বেহুলাচরিত্রটি কোমলে-কঠোরে এক অপূর্ব শ্রীধারণ করেছে। বেহুলার কুলবধূর শান্তস্নিগ্ধ কুসুমপেলবতা আর সেই সঙ্গে দৈবের সঙ্গে সংগ্রামের বজ্রকঠোর দৃঢ়তা উজ্জলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নারায়ণ দেবের বেহুলা একালের কবি মধুসূদনের আশ্চর্য সৃষ্টি বীরাঙ্গনা প্রমীলার প্রতিভাস। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে মহাকাব্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যুগপরিবেশের জন্যই সে সম্ভাবনা চরিতার্থ হয়নি।

চরিত্ররূপায়ণে, কবিত্বশক্তিতে ও কাহিনীগ্রন্থনে নারায়ণ দেব বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এদিক থেকে তাঁর স্থান অন্যতম জনপ্রিয় কবি বিজয় গুপ্তের অনেক উর্ধ্বে। জনৈক সমালোচকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "প্রকাশভঙ্গী, কাহিনী-রচনা, চরিত্রসৃষ্টি—সর্বোপরি ভাবাদর্শের উপস্থাপনায় নারায়ণ দেবের পদ্মা-পুরাণকে যদি প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হয়, তবে বিজয় গুপ্তের কাব্যকে গল্পবৈচিত্র্যে পুষ্ট শ্লথবন্ধন কাহিনী-কাব্যের সঙ্গে তুল্য মনে করা যেতে পারে। নারায়ণ দেবের কাব্য জীবনরসের আকর—বিজয়গুপ্তের কাব্যে গল্পরসই প্রধান।"

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

কবিকথা ॥ পশ্চিমবঙ্গবাসী মনসামঙ্গলকাব্যরচয়িতাদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ। 'ক্ষেমানন্দ' প্রকৃত নাম, 'কেতকাদাস' উপাধি। মনসাদেবীর পরম ভক্ত বলে কবি কোথাও কোথাও নিজেকে 'কেতকাদাস' বলেছেন। দেবী মনসার এক নাম কেতকা—

বনের ভিতর জন্মাইল মনসাকুমারী।
কেআ পাতে জন্মাইল কেতকাসুন্দরী ॥

কেউ কেউ কেতকাদাস আর ক্ষেমানন্দ পৃথক ব্যক্তি মনে করেন কিন্তু তা যথার্থ নয় ধারণা। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের অধিবাসী এবং জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। নানাপ্রকার অশান্তির দরুণ তিনি দেশত্যাগ করেন। বিচিত্র পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে বাল্যকাল কাটে। অবশেষে রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্লের নিকট থেকে তিনি দান হিসেবে তিনটি গ্রাম লাভ করেন। সেখানে বাস করার কালে একদিন সন্ধ্যাবেলায় খড় কাটতে কবি মুচিনী বেশ-ধারিণী মনসার সাক্ষাৎলাভ করেন এবং দেবীর নির্দেশে কাব্য রচনা করেন। কবির কাব্যে রচনা-কালের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন এক সময়ে তিনি কাব্য রচনা করে থাকবেন।

কাব্যকথা॥ ক্ষেমানন্দ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ লক্ষণীয়। তিনি অনেক স্থানের যথাযথ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়েছেন। সকল কবিই বেহুলার স্বর্গপুরী গমনের মোটামুটি একটি পথরেখা অঙ্কিত করেছেন, তাতে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবের তুলনায় কবিকল্পনার প্রভাব সমধিক। কিন্তু ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথের "যে ২২টি ঘাট বা গ্রামের নাম আছে, তন্মধ্যে ১৪টি ঘাট বা গ্রাম এখনও দামোদর ও তাহার শাখা বাঁকা নদীর এবং বর্তমান বেহুলা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত।"

ক্ষেমানন্দের রচনারীতি খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। অলঙ্কারপ্রয়োগে তিনি সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করলেও রচনায় সরলতা ও স্বচ্ছন্দতা রয়েছে। তাঁর কাব্যে মুকুন্দরামের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যাবে।

হাস্য ও কৌতুকরস সৃষ্টিতে এবং চরিত্রচিত্রণে কবির দক্ষতা প্রশংসনীয়। চাঁদের চরিত্রমহিমা তাঁর হাতে কিছুটা খর্ব হলেও বেহুলার চরিত্র অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বেহুলাকে সীতার আদর্শে চিত্রিত করেছেন। সীতার পাতিব্রত্যের পবিত্রতা বেহুলাকে শুচিস্নিগ্ধ করে তুলেছে। বেহুলার চরিত্রে আত্মগরিমা ও মর্যাদার একটি সুন্দর ভাব তিনি পরিস্ফুট করেছেন। স্বামীর মৃতদেহ ত্যাগ করে পিত্রালয়ে ফিরে আসার জন্য ভায়েরা অনুরোধ জানালে বেহুলা তার সগর্ব উত্তর দিয়েছে এরূপ—

বেহুলা বলেন আমি হৈল্যাম কড়্যা রাঁড়ী।
কত ফেলাইব ভাই নিরামিষ্যা হাঁড়ী॥
মা বাপের বাড়ীতে আমারে নাহি সাজে।
সকল ভাউজের সঙ্গে মোর দ্বন্দ্ব বাজে॥
সহিতে না পারি আমি দুরক্ষর বাণী।
কূলে দাঁড়াইয়া ভাই আর কান্দ কেনি॥

মনসার ঈর্ষাকুটিল চরিত্রটি কবি খুব চমৎকার এঁকেছেন। বিষপানে পিতা শিবের মৃত্যুতে মনসা খুশী হন, কারণ তাঁর বিমাতা চণ্ডী 'রণ্ডিকা' অর্থাৎ বিধবা হল। সর্পদেবীর ভয়াবহ নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব এই ঘটনায় কবি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

ক্ষেমানন্দের কাব্যটিকে অনেকগুলি পালার একটি বৃহৎ সঙ্কলন বলা চলে। প্রতিটি পালা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যথেষ্ট বিস্তৃত কিন্তু পালাগুলির মধ্যেকার যোগসূত্র একান্ত ক্ষীণ।

সাহিত্য ও সমাজজীবনে শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্যের জীবন

'বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।'

বাস্তবিক নিমাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য যেন একজন ব্যক্তিমাত্র নন। বাঙালীর যা কিছু শুচিশুভ্র ও সুন্দর তিনি যেন তারই ঘনীভূত নির্যাস। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও জীবনলীলা শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। বড় ভাই বিশ্বরূপের নামের অনুসারে চৈতন্যের ভাল নাম রাখা হয় বিশ্বম্ভর। ডাক নাম ছিল নিমাই। গায়ের রঙ গৌর ছিল বলে লোকে তাঁকে গোরা বা গৌরাঙ্গ নামেও ডাকত। বাল্যে চৈতন্য অতি দুরন্ত ছিলেন। তাঁর দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে পিতা জগন্নাথ অল্প বয়সে তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করে দেন। অসামান্য মেধাবী চৈতন্য স্বল্পকালেই ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, বেদান্ত ইত্যাদি নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি হল।

পিতার মৃত্যুর পর চৈতন্য স্বয়ং টোল খুলে অধ্যাপনা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে মায়ের আগ্রহে দরিদ্র ঘরের মেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করলেন। বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি পূর্ববঙ্গে পর্যটনে গেলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে সর্পদংশনে পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুকথা শুনে চৈতন্য মনে খুব আঘাত পেলেও মায়ের মুখ চেয়ে আবার বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করলেন। বিবাহের অল্পদিন পরে চৈতন্য পিতৃশ্রাদ্ধ দিতে গয়াধামে গেলেন। সেখানে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর মিলন হল। বিষ্ণুপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে গিয়ে ভাবান্তর ঘটায় এবং ঈশ্বরপুরীর আধ্যাত্মিকতায় আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। গৃহে ফিরে চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে হরিনাম সংকীর্তন প্রভৃতিতে মেতে উঠলেন। চৈতন্যের সঙ্গে ভগবৎ নামসংকীর্তনে লোকে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। স্থানীয় কাজী (মুসলমান শাসনকর্তা) সংকীর্তন মানা করে দিলেন। চৈতন্য এই অন্যায় নিষেধ মানলেন না। নবদ্বীপের রাজপথ দিয়ে বিরাট সংকীর্তন শোভাযাত্রা বার করলেন। বিরাট জনতা ও তাদের বিক্ষুব্ধ মূর্তি দেখে কাজী ভয় পেয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাসকশক্তির বিরুদ্ধে এই প্রথম গণ-জাগরণ।

চব্বিশ বৎসর বয়সে চৈতন্য গৃহত্যাগ করে কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাসে দীক্ষিত হলেন। তখন তাঁর নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংক্ষেপে, চৈতন্য। সন্ন্যাসীর গৃহে থাকতে

নেই। তাই মায়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করার জন্য চলে এলেন। নীলাচলে দু-বছর থাকার পর তিনি বার হলেন ভারতবর্ষের তীর্থ-পর্যটনে। প্রথমবারে তিনি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র পরিক্রমা করে এলেন। দ্বিতীয়বারে গৌড়ের পথে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু গৌড় হয়ে রামকেলি পর্যন্ত পৌঁছে তাঁকে নীলাচলে ফিরে আসতে হল। বছর দুই পরে শ্রীচৈতন্য আবার বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ালেন। উড়িষ্যার ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে প্রথমে বারাণসী, তারপর প্রয়াগে পৌঁছলেন। শেষে মথুরা-বৃন্দাবনে। মথুরা-বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে নীলাচলে স্থায়ী বসবাস করলেন। নীলাচল ছেড়ে আর কোথাও কখনো তিনি যাননি। জীবনের শেষ কটি বছর তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটে। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই) তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র আটচল্লিশ বৎসর।

সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব

বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুভাবেই পড়েছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে দুটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল— (১) চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য ও (২) চৈতন্য পদাবলী

১. চৈতন্যপ্রভাবে উদ্দীপিত বাঙালীর নবচেতনায় আনন্দময় বিলাস কাব্যসৃষ্টি আর এই কাব্যরচনা মানুষকে কেন্দ্র করেই। শ্রীচৈতন্য তাঁর ভক্তদের চোখে দেবতা বলে প্রতিপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। এই দেবকল্প মহামানবটির জীবনকথা তাই পদে, গানে, কাব্যে ধরে রাখার প্রয়াস হল আর তাতেই বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্তের স্বর্ণদ্বার খুলে গেল। কত বৈষ্ণব কবি দেখা দিলেন। ভক্তপ্রাণ এই প্রেমাবতার মানুষটির ভাগবত-জীবন নিয়ে তাঁরা কাব্যরচনা শুরু করলেন। সৃষ্টি হল এক নতুন সাহিত্যধারা—চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য।

২. কৃষ্ণপ্রেমে ঢলঢল এই দিব্যকান্তি তরুণ সন্ন্যাসীর রাধাভাবে ভাবিত ভাবমূর্তিকে নিয়ে লেখা হল বহু পদ যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে খ্যাত। এছাড়াও শ্রীচৈতন্যের কৈশোরজীবন, যৌবনলীলা, সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি ব্যক্তিজীবনের বাস্তবরূপ নিয়েও লেখা হল অনেক পদ, যাকে বলা যেতে পারে গৌরাঙ্গবিষয়ক রচনা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে বাঙালী কবি ইতিমধ্যে পদরচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনমহিমা নিয়ে পদ রচনা করায় বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের পদাবলীর ধারার সঙ্গে এক নূতন ধারার সংযোজন ঘটল তা চৈতন্য পদাবলী। এই হল বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলশ্রুতি। আমরা এখন পরোক্ষ প্রভাবের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

এক ॥ কৃষ্ণবিরহিণী রাধার মূর্তি আঁকতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের পরিজ্ঞাত

কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদী চৈতন্যের আদলেই তাঁকে রূপ দিলেন। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমার্তির মধ্যেই তাঁরা রাধার বেদনামাধুর্য অনুভব করতে সক্ষম হলেন। এক আবেগবন্যায় আলোড়িত হয়ে উঠল ভক্ত কবিদের হৃদয়ভূমি। অজস্র পদরচনাগানে সেই আবেগ-বন্যা শতধারায় উৎসারিত হল। পদাবলী সাহিত্যের প্রসারতা ও ব্যাপকতা বিপুল-ভাবে বেড়ে গেল।

দুই ॥ পদাবলীর কবিভাষার সমৃদ্ধি ঘটল। চৈতন্য-ভাববন্যায় উদ্বেল কবির লেখনীমুখে কখনো বাংলা, কখনো ব্রজবুলি, কখনো ব্রজবুলি-সংস্কৃত-মিশ্র বাংলা অপরূপ বিচিত্রতায় ফুটে উঠল। 'দেখ সখি মধুর সুবেশম্', 'কি কহব রে সখি আজু আনন্দক ওর' ইত্যাদি এর দৃষ্টান্ত। যে চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্ম দ্বিজচণ্ডালকে ভক্তির ক্ষেত্রে একাকার করেছিল, তারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতিরূপে বাংলা-সংস্কৃত-ব্রজবুলি একাসনে এসে বসল। বাংলা ভাষা কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত বিচিত্র মনোভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠল। শ্রীচৈতন্যের ঐশীজীবনপ্রেরণায় প্রাণিত না হলে এত সহসা এই সমৃদ্ধি ঘটত না।

তিন ॥ শ্রীচৈতন্যজীবনীসাহিত্যের উদ্ভবের ফলে ইতিহাস-বোধের জাগরণ হল। মানুষের জীবন-পরিচয় কাব্যে ধরে রাখার আগ্রহের সঞ্চার হল। ফলে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত অনুচর-পরিকরবৃন্দেরও জীবনী-রচনার সূত্রপাত হল। চৈতন্যজীবনীকাব্য 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতির সঙ্গে রচিত হল 'অদ্বৈতপ্রকাশ', 'নিত্যানন্দবিলাস' প্রভৃতি মহান্তচরিত।

চার ॥ কীর্তন-সঙ্গীতের ধারাসৃজনে শ্রীচৈতন্যের রসতৃষা বীজ বুনেছিল। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের নিয়ে নিত্য-অনুষ্ঠান ছিল নামসংকীর্তন। নীলাচলে বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদগানও তাঁর নিত্যকৃত্য ছিল। এই নামসংকীর্তন, পদগানের পথ বেয়েই বাংলার কীর্তন-সঙ্গীতের বিকাশ ঘটেছিল।

পাঁচ ॥ শ্রীচৈতন্যের মহাজীবনের সংস্পর্শে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এসেছিলেন বলেই তাঁদের অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলি (যদিও সংস্কৃতে) রচিত হতে পেরেছিল। আর রচিত হয়েছিল বলেই বাংলায় এগুলির সার-সঙ্কলন হয়েছিল। এতে অনুবাদ-সাহিত্য পুষ্ট হয়েছিল। এগুলির নিগূঢ় তত্ত্ব ও দার্শনিক-কথা আলোচনার ফলে বাঙালীর মননশীলতা ও চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটেছিল।

ছয় ॥ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদেও চৈতন্যপ্রভাবের চিহ্ন দেখা যাবে। ভাগবতপুরাণের অনুবাদের যে ধারা মালাধর বসুর হাতে শুরু হয়েছিল, তাতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ বড় হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যপ্রভাবে মাধুর্যপ্রধান কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর দিকেই বাঙালীর প্রবণতা দেখা দিল। রামায়ণে ভক্তিরসসিক্ত পরিবেশ স্পষ্ট আভাসিত

হয়ে উঠল। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত নামগান স্পষ্ট দেখতে পাই তরণীসেনের রণসজ্জায়। তরণীসেনের পতাকায়, রথে সর্বত্র লেখা রাম-নাম। এই নামমাহাত্ম্য শ্রীচৈতন্যেরই দান, অনুমান।

সাত ॥ বাংলা মঙ্গলকাব্যেও চৈতন্যপ্রভাব লক্ষণীয়। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর উগ্রতা হ্রাস পেল। এইসব চরিত্রে এল কোমল পেলবতা। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শ্রীমন্তের শৈশবকাল আঁকতে গিয়ে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার হুবহু অনুসরণ করেছেন। চৈতন্যদেবের চরিত্রের কমনীয়তা ও মাধুর্য চাঁদ সদাগরে সঞ্চারিত হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বঞ্চিত জীবনের কারুণ্য বেহুলার চরিত্রে কারুণ্যসৃষ্টির উপাদান যুগিয়েছে। মঙ্গলকাব্যের বন্দনা-অংশে নানা দেবদেবীর পাশে চৈতন্যবন্দনাও দেখা দিয়েছে।

আট ॥ প্রাক্চৈতন্যযুগে সাহিত্যের রুচি ছিল স্থূল। কি প্রেমচিত্রাঙ্কনে, কি হাস্যরসের পরিবেশনে এই স্থূলতা ও গ্রাম্যতা চৈতন্য-পূর্ববর্তী সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। চৈতন্যদেব যে রুচি ও নীতিবোধের সমুন্নতি ঘটান, চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে সেই রুচিবোধের প্রতিফলন আভাসিত।

নয় ॥ চৈতন্যপ্রভাবে বাংলা সাহিত্যে ভক্তিরসের প্লাবন এল। প্রাক্চৈতন্যযুগে ধর্মকর্ম ছিল আনুষ্ঠানিক—'ধর্মকর্ম করে সবে এইমাত্র জানে'। চৈতন্যোত্তরযুগে এল শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা। চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মমতে দেবতা হয়ে উঠলেন মানুষের পরম প্রিয়জন, তাঁর প্রতি ভক্তি হয়ে দাঁড়াল প্রেমভক্তি। চৈতন্যোত্তরযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে তো বটেই, বৈষ্ণবেতর সাহিত্যেও দেবতা-মানুষে গড়ে উঠল নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক।

এ ভাবেই শ্রীচৈতন্য নিজে সাহিত্যস্রষ্টা না হয়েও (তিনি সংস্কৃতে মাত্র আটটি শ্লোক লিখেছিলেন—এগুলি 'শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত) বাংলা সাহিত্যকে সৃষ্টির প্রাচুর্যে এবং অপরূপ ভাবসমৃদ্ধিতে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যে বিচিত্র ও বিপুল উৎকর্ষ ঘটেছে, তার মূল কারণ তিনি। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে স্বর্ণময় অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে, সেই স্বর্ণময় অধ্যায়-রচনার একমাত্র শিল্পী-পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব।

সমাজজীবনে শ্রীচৈতন্যদেব

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের যেমন এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল, বাংলার সমাজজীবনেও তেমনই এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

১. শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার সমাজজীবন বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। বাঙালী তার মানসিক ও চারিত্রিক বল হারিয়েছিল। বর্ণভেদ,

নানারকমের অধিকার ভেদ এবং তার ফলে মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান জাতিকে ঐক্যহীন, দুর্বল ও পঙ্গু করে রেখেছিল। ঠিক এই সময়ে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করলেন যেন আঁধারের বুকে ঘটল 'চন্দ্রোদয়'। তাঁর দিব্যজীবন আলোকবিভায় বাঙালীর জীবনের চারদিকের অন্ধকার সরে যেতে লাগল। তিনি ঘোষণা করলেন—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম থাকলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ। মানুষের মূল্যবোধের নতুন ভাষ্যে জাতি তার দীর্ঘদিনের উচ্চনীচের ভেদাভেদ ভুলে গেল। এক আশ্চর্য মানবপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জাতি পরিশুদ্ধ হয়ে উঠল, তার নতুন জন্ম—নবজাগরণ হল। একেই ঐতিহাসিকেরা বলেছেন 'চৈতন্যরেনেশাঁস'।

২. উচ্চ বর্ণের হিন্দুর কঠোর ভেদবৈষম্যে নির্যাতিত, অবজ্ঞাত নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলামধর্মের সাম্যমৈত্রীতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। চৈতন্যের প্রচারিত প্রেমধর্মে জাতিবর্ণের ভেদাভেদ নেই দেখে, আদ্বিজচণ্ডালকে একসূত্রে বাঁধবার প্রচেষ্টা দেখে আর তারা ধর্মান্তরিত হবার আগ্রহ বোধ করল না। ফলে ধর্মান্তরপ্রবণতা কমে এল। হিন্দুর সামাজিক ভাঙন হল প্রতিরুদ্ধ।

৩. বিধর্মী রাজশক্তির অত্যাচার উৎপীড়নে জাতি ভীতসন্ত্রস্তভাবে দিন কাটাচ্ছিল, রাজশক্তির বিরুদ্ধে তার মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস ছিল না। মুসলমান কাজী সংকীর্তন মানা করলে চৈতন্য কিন্তু রাজপথে শোভাযাত্রা বার করে প্রতিবাদ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কাজীকে সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হয়েছিল। রাজশক্তির বিরুদ্ধে চৈতন্যের এই বলিষ্ঠ সংগ্রামীর ভূমিকা ভয়বিহ্বল বাঙালীর জীবনে সাহস ও নির্ভয়তার সঞ্চার করেছিল। চৈতন্যদেব বাঙালী জাতির অন্তরে জাগিয়ে তুলেছিলেন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস।

৪. শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্মে হিন্দু-মুসলমান একাকার হয়ে গিয়েছিল। যবন হরিদাস তাঁর ভক্তমণ্ডলীতে এক মর্যাদাময় আসন পেয়েছিলেন। ম্লেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হোসেন শাহের দুই মন্ত্রী রূপ সনাতন তাঁর আশ্রয় পেয়েছিল। এক উদার মানবপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জাতি এক নতুন সমাজসংগঠনে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্য সমস্ত অর্থহীন আচার, কুসংস্কার ও ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে বাঙালীকে এক অখণ্ড জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মধ্যযুগের বাঙালীর আত্মচেতনা উজ্জীবনের প্রাণপুরুষ ও সর্বাধিনায়ক, তাঁর আবির্ভাব-কালসীমাকে 'চৈতন্য যুগ' অভিধায় ঐতিহাসিকেরা চিহ্নিত করেছেন। এ অভিধা সর্বতোভাবে যথার্থ ও সঙ্গত।

চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গলকাব্যের পরেই চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের স্থান। দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকে অবলম্বন করে যে মঙ্গলকাব্য রচিত তাই চণ্ডীমঙ্গলকাব্য। এই কাব্যে দুটি উপাখ্যান রয়েছে—(১) কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান ও (২) ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। মনসামঙ্গলের ন্যায় এ কাব্যের কাহিনীও সুপ্রাচীন, ধারণা।

ভারতবর্ষে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই চণ্ডীপূজা হয়ে আসছে। ভারতীয় তন্ত্র-পুরাণাদিতে চণ্ডীর উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত মার্কেণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এই চণ্ডীকে চণ্ড-মুণ্ড-মহিষাসুরের বিনাশিনী-রূপেই দেখা যায়। চণ্ডীমঙ্গলের পূজিতা চণ্ডী এই চণ্ডী থেকে পৃথক হলেও একদল পণ্ডিত এ দুয়ের একটি যোগসূত্র কল্পনা করেছেন। পৌরাণিক চণ্ডী শিবের পত্নী, শিব-শক্তি। প্রচণ্ড তাঁর ক্রোধ। তাঁর আবির্ভাবে অসুরদল বিনষ্ট হয়। কিন্তু বাংলার চণ্ডীমঙ্গলে আমরা যে চণ্ডীদেবীর সাক্ষাৎ পাই, তিনি কেবল শত্রুর বিনাশ করেন না, ভক্তকে আপৎকালে রক্ষা করেন। ইনি মঙ্গলবিধায়িনী সর্বমঙ্গলা। তাই তাঁর নাম মঙ্গলচণ্ডী। আমাদের দেশে যে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক জাতির বসবাস ছিল, তাদের সমাজ থেকেই মঙ্গলচণ্ডী আর্যসমাজে গৃহীত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তন্ত্র-পুরাণাদির চণ্ডী এবং লৌকিক চণ্ডী এমনভাবে সমন্বিত হয়ে গেছেন যে, তাঁতে কতটুকু আর্যেতর আর কতটুকু আর্যসংস্কৃতি আছে তা নির্ণয় করা কঠিন।

সমস্ত চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতেই দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে। (১) আখেটিক খণ্ড অর্থাৎ কালকেতু ব্যাধের গল্প ও (২) বণিক খণ্ড অর্থাৎ ধনপতি সদাগরের গল্প। কাহিনী দুটি আলাদা, পরস্পরের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। প্রথম কাহিনীটিই প্রাচীনতর, ধারণা।

কাহিনী॥ প্রথম আখ্যানে ব্যাধ কালকেতু কিভাবে মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার করলেন, তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

স্বামী শিব শ্মশানবাসী, সংসারে অমনোযোগী—তার উপর নিত্য অভাব-অনটন। চণ্ডীর দুঃখ দেখে সহচরী পদ্মা তাঁকে বললেন, মর্ত্যে তাঁর পূজা হলে তাঁর কষ্ট দূর হবে। পদ্মার উপদেশে চণ্ডী মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য উদ্যোগী হলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে দিয়ে পূজা প্রচারের ইচ্ছা করলেন। কিন্তু স্বর্গবাসী নীলাম্বরকে কিভাবে পাঠানো যায় মর্ত্যে ?

শিব দেবীর অনুরোধে নিরপরাধ নীলাম্বরকে শাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠাতে রাজী না হলে দেবী চণ্ডী ছলনার আশ্রয় নিলেন। নীলাম্বর পিতা ইন্দ্রের শিব-পূজার ফুল তুলে

আনলে দেবী সেই ফুলে কীট হয়ে লুকিয়ে থাকলেন। ইন্দ্র যেই ফুল শিবের মাথায় দিলেন, অমনি কীটরূপী দেবী শিবকে দংশন করলেন। দংশনের যন্ত্রণায় কাতর শিব পুষ্পচয়নকারী নীলাম্বরকে ব্যাধরূপে মর্ত্যে জন্মানোর অভিশাপ দিলেন। নীলাম্বর ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্ররূপে জন্মালেন—নাম হল কালকেতু। নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াও স্বামীর অনুগামিনী হয়ে সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কন্যারূপে জন্মালেন, নাম হল ফুল্লরা।

দিনে দিনে কালকেতু ও ফুল্লরা বড় হয়ে উঠল। তারপর এক শুভদিনে শুভলগ্নে কিশোর কালকেতুর সঙ্গে কিশোরী ফুল্লরার হল বিবাহ। কালকেতু সারাদিন বনে ঘুরে পশুপাখী শিকার করে আনে আর ফুল্লরা বাজারে মাংস বিক্রয় করে। দুঃখ-দারিদ্র্য সত্ত্বেও তারা মনের সুখেই ছিল। এই দরিদ্র দম্পতিকে দেখে দেবীর কৃপা করতে ইচ্ছা হল। তিনি এদের সাহায্যে মর্ত্যে আপন পূজা প্রচার করতে মনস্থ করলেন। একদিন কালকেতু শিকারে এলে দেবী সমস্ত পশু-পাখীকে মায়াবলে অদৃশ্য করে পথের উপরে পড়ে থাকলেন একটি স্বর্ণ-গোধিকারূপে। কালকেতু শিকারে কিছু না পেয়ে সেই স্বর্ণ-গোধিকাকে ধনুকের ছিলাতে বেঁধে ঘরে আনল। ফুল্লরা বাড়ী ছিল না। পথে ফুল্লরাকে গোধিকাটি পোড়াতে বলে বাজারে গেল কালকেতু।

এদিকে দেবী চণ্ডী গোধিকার রূপ ত্যাগ করে একটি সুন্দরী যুবতীর বেশে কালকেতুর কুঁড়ের দাওয়ায় বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে ফুল্লরা ফিরে এসে দেবীকে দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল। ফুল্লরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে দেবী চণ্ডী বললেন, সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি পালিয়ে এসেছেন। যদি ফুল্লরা অনুমতি দেয়, তবে এখানে কিছুদিন থাকবে।

তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি।
এই স্থানে কতকদিন করিব বসতি ॥

ফুল্লরা দেবীকে পতিগৃহে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করল। তাদের বারমাসের দুঃখকষ্টের একটা লম্বা ফিরিস্তি দিল। কিন্তু দেবী তাতে নড়লেন না। তখন ফুল্লরা কালকেতুর কাছে গিয়ে সুন্দরী রমণীর বৃত্তান্ত জানাল। কালকেতু বাড়ী ফিরে যুবতীবেশী দেবীকে গৃহে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করল। দেবী তখন নিজের আসল পরিচয় দিলেন এবং কালকেতুকে দিলেন একটি মূল্যবান আংটি ও সাতঘড়া মুদ্রা।

কালকেতু মুরারি শীলের কাছে আংটি বিক্রয় করতে গেলে ধূর্ত বেণে তাকে ঠকাবার চেষ্টা করল কিন্তু শেষপর্যন্ত দেবীর আদেশে দিল যথার্থ মূল্য। কালকেতু দেবীদত্ত অর্থে গুজরাটে বন কাটিয়ে করল নগরপত্তন। যারা কালকেতুর নগরে বাস করতে এল, তাদের মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত নামে এক খল-প্রকৃতির লোক ছিল। সে

কালকেতুর কাছে একটা উঁচু পদ পেয়ে সেই পদের জোরে প্রজাদের উপর করতে লাগল অত্যাচার। প্রজাদের অভিযোগে কালকেতু তাকে রাজ্য থেকে দিল তাড়িয়ে। ভাঁড়ু দত্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কলিঙ্গরাজকে দিয়ে কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করাল। যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত ও বন্দী হল। দেবী তখন কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে পরম ভক্ত কালকেতুকে ছেড়ে দিতে আদেশ করলেন। কালকেতুকে দেবীর ভক্ত জেনে রাজা অবিলম্বে মুক্ত করে দিলেন তাকে। কালকেতু নিজ রাজ্যে ফিরে এল। মর্ত্যে দেবীর পূজাপ্রচার শেষে শাপাবসানে কালকেতুরূপী নীলাম্বর ও ফুল্লরারূপী ছায়া ফিরে গেল স্বর্গে। পিতার অবর্তমানে গুজরাটে রাজ্যশাসন করতে লাগল কালকেতুর পুত্র পুষ্পকেতু।

দ্বিতীয় আখ্যানে ধনপতি সদাগরের দ্বারা দেবীর পূজা মর্ত্যে কিভাবে প্রচারিত হল, তাই বর্ণিত হয়েছে।

নিম্নতর সমাজে পূজা প্রচলিত হলে পর দেবী চণ্ডী মর্ত্যে উচ্চতর সমাজে পূজা-প্রচারের জন্য সচেষ্ট হলেন। সুরসভায় নর্তকী রত্নমালার তালভঙ্গের সুযোগ নিয়ে তাকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করার জন্য দিলেন অভিশাপ। রত্নমালা লক্ষপতি বণিকের ঘরে তাঁর মেয়ে খুল্লনারূপে জন্ম নিল।

উজানি নগরে ধনপতি নামে এক বণিক ছিলেন। একদিন পায়রা ওড়াতে গিয়ে তিনি লক্ষপতির মেয়ে খুল্লনাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করলেন। প্রথমা পত্নী লহনা এই বিয়ের কথায় বেঁকে বসলেন। ধনপতি তাকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করে এবং সোনার গয়না গড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সম্মতি আদায় করলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির হল বিবাহ। বিবাহের কিছুকাল পরেই রাজার আদেশে ধনতিকে বিদেশে যেতে হল। বিদেশে যাবার কালে ধনপতি খুল্লনার দেখাশুনার ভার লহনার উপরে দিয়ে গেলেন। প্রথমে লহনা খুল্লনাকে প্রীতির চোখে দেখত কিন্তু শেষে দাসী দুর্বলার প্ররোচনায় বিষ চোখে দেখতে লাগল। ধনপতির জাল চিঠি দেখিয়ে বনে বনে ছাগল চরাতে বাধ্য করল খুল্লনাকে। খুল্লনা প্রত্যহ বনে ছাগল চরায়। একদিন বনের ভিতর একটি ছাগল হারিয়ে গেল। প্রকৃত ব্যাপার, দেবী চণ্ডী খুল্লনাকে দিয়ে পূজা করানোর জন্য ছাগলটিকে লুকিয়ে ফেলেন। ছাগলের খোঁজ করতে করতে খুল্লনা চণ্ডীপূজারতা পঞ্চদেবকন্যাকে দেখল। খুল্লনা তাদের কাছে দেবীর পূজার পদ্ধতি শিখে নিয়ে করল দেবীর পূজা। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পতিসোহাগিনী ও পুত্রবতী হবার বর দিলেন এবং ফিরিয়ে দিলেন লুকিয়ে রাখা ছাগল।

কিছুকাল পরে ধনপতি গৃহে ফিরলেন। খুল্লনা স্বামীসোহাগে পূর্বের দুঃখকষ্ট

ভুলল। সুখেশান্তিতে দিন কাটছিল, এমন সময়ে রাজা ধনপতিকে সিংহলে যাবার আদেশ করলেন। খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলের জন্য চণ্ডীপূজা করতে বসল। শিবভক্ত ধনপতি ডাকিনী দেবতা বলে চণ্ডীর ঘটে মারলেন লাথি। দেবী এতে ক্রুদ্ধ হলেন বেজায়। যখন সাতখানি ডিঙ্গা নিয়ে ধনপতি সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, তখন দেবী তাঁর পণ্যবোঝাই ছয়খানি ডিঙ্গা জলে ডুবিয়ে দিলেন। কেবলমাত্র মধুকর ডিঙ্গাটি নিয়ে ধনপতি সিংহলে পৌছলেন। সিংহলের তীরে ডিঙ্গা ভিড়াবার আগে ধনপতি সমুদ্রে কালীদহে দেখলেন একটি অপূর্ব দৃশ্য। এই দৃশ্য 'কমলে কামিনী' নামে বিখ্যাত।

কমলে কামিনী অবতার।
ধরি রামা বাম করে উগারয়ে করিবরে
পুনরপি করয়ে সংহার ॥

সিংহলের রাজাকে ধনপতি এই অদ্ভুত ব্যাপারটি জানালেন। রাজা ধনপতিকে এই দৃশ্যটি চাক্ষুষ করাতে বললেন। তখন উভয়ের মধ্যে একটি সর্ত হল—ধনপতি 'কমলে কামিনী' দেখাতে পারলে রাজা তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন, আর না পারলে ধনপতিকে ভোগ করতে হবে দ্বাদশ বৎসরের কারাবাস। ধনপতি রাজাকে 'কমলে কামিনী' দেখাতে পারলেন না। ফলে সর্তানুয়ায়ী ধনপতিকে কারারুদ্ধ হতে হল। দেবী কারাগারে স্বপ্নে ধনপতিকে বললেন, তাঁর পূজা করলে এ দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ মিলবে। তথাপি পূজা স্বীকার করলেন না ধনপতি।

এদিকে খুল্লনার একটি পুত্র হল। মালাধর নামে এক গন্ধর্ব শিবের শাপে খুল্লনার পুত্র হয়ে জন্মাল। শিশুর নাম রাখা হল শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত বড় হয়ে নিরুদ্দিষ্ট পিতার খোঁজে সিংহল যাত্রা করল। পথিমধ্যে শ্রীমন্তও সেই 'কমলে কামিনী' দৃশ্য দেখল এবং পিতারই মত রাজাকে দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেখাতে পারল না। শ্রীমন্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। মশানে শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করতে লাগল। মশানে এসে হাজির হলেন ভক্তবৎসলা দেবী। দেবীর অনুচর ভূতপ্রেতের হাতে পরাজিত হয়ে পালাল রাজার সৈন্যেরা। চণ্ডীর কৃপায় সিংহলের রাজা দেখলেন 'কমলে কামিনী' দৃশ্য। ধনপতি মুক্ত হল। মিলন হল পিতাপুত্রের। সিংহলরাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে হল। বিবাহের শেষে পুত্র-পুত্রবধূসহ ধনপতি করলেন স্বদেশযাত্রা। পথে দেবীর কৃপায় ধনপতি তাঁর জলে ডোবা ছয় ডিঙ্গা ফিরে পেয়ে সম্মত হলেন চণ্ডীর পূজা করতে। শিবপূজা করতে বসে ধনপতি শিব ও পার্বতীকে অভিন্ন জেনে অনুতপ্ত-চিত্তে দেবীর পূজা করলেন। চণ্ডীর পূজা জগতে প্রচারিত হল। যথাসময়ে শাপ-মোচনের পর শাপভ্রষ্ট স্বর্গবাসীরা ফিরে গেলেন স্বর্গে।

কবিবৃন্দ

মনসামঙ্গলের যেমন অজস্র কবির সন্ধান পাওয়া যায়, চণ্ডীমঙ্গলের তেমন পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করার মত দুজন কবির পরিচয় পাওয়া গেছে। এঁরা চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীকে ব্রতকথার গণ্ডী থেকে মুক্ত করে যথার্থ মঙ্গলকাব্যের বিস্তার দিয়েছেন। প্রথমে আদিকবি মাণিক দত্তের কথা আলোচনা করছি।

মাণিক দত্ত

মাণিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি হিসেবে পরিচিত। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে মাণিক দত্তের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী মাণিক দত্তের স্বকপোলকল্পিত নয়, ধারণা। লোকমুখে প্রচলিত কোন প্রাচীন গীতকে কাব্যের আকারে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে থাকবেন। কাহিনী সংক্ষিপ্ত হলেও কবি ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার চরিত্রে মোটামুটি পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রেখেছেন। ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রচিত্রণে কবির দক্ষতা প্রশংসাযোগ্য।

দ্বিজমাধব

কবিকথা ॥ দ্বিজমাধব চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবি কাব্যে দ্বিজমাধব ও দ্বিজমাধবানন্দ ভণিতা দিয়েছেন। কবির আত্মপরিচয় থেকে 'মাধব আচার্য' নামও পাওয়া যায়। কবির পিতার নাম পরাশর। ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর নিবাস কোথায় ছিল, এ বিষয়ে বলা শক্ত। তাঁর কাব্যের যাবতীয় পুথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। তাই কেউ কেউ কবিকে চট্টগ্রামবাসী মনে করেন। কিন্তু কবির যে আত্মপরিচয় মেলে, তাতে কবিকে চট্টগ্রামবাসী মনে করা চলে না। কবির আত্মপরিচয় নিম্নরূপ পাওয়া যায়—

ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।……
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য।

এ থেকে মনে হয়, কবি পশ্চিমবঙ্গবাসী ছিলেন। কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে তাঁর কাব্যরচনা করেন। কবির কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল' বা 'সারদাচরিত'।

কাব্যকথা ॥ চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে সর্বপ্রথম প্রথম শ্রেণীর কাব্যের মর্যাদা দান করার গৌরব দ্বিজমাধবেরই। মুকুন্দরামের মত কবিত্বশক্তির অধিকারী না হলেও তাঁর রচনার স্বাভাবিক বর্ণনাগুণ ও সহজ বাস্তবতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কবি ব্যাধ কালকেতুর শৈশবের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—

বাঁটুল বাঁশ লয়ে করে পশুপক্ষী চাপি ধরে
কাহার ঘরেতে নাহি যায়।

কুঞ্চিত করিয়া আঁখি থাকয়ে মারিয়া পাখী
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ি যায়॥

বর্ণনার গুণে বলিষ্ঠদেহ, নিপুণ শিকার-সন্ধানী ব্যাধশিশু কালকেতুর মূর্তিটি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে মুকুন্দরাম এই বর্ণনাকেই অলঙ্কার ও বর্ণ-বিন্যাসে আরো কবিত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।

প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ কৌতুকরসের পরিবেশনেও কবির কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। খুল্লনা-লহনা খেতে বসে মাছের মুড়া নিয়ে পরস্পরকে সাধাসাধি করছে, আর এই ফাঁকে বিড়াল মাছের মাথাটি নিয়ে সরে পড়ছে, এই বর্ণনার সহজ সরসতা উপভোগ্য—

মুড়া লইয়া পেলাপেলি কেহ নাহি খায়ে।
উভার উপরে থাকি বিড়াল আড়চোখে চাহে॥
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে।
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে॥

কৌতুকরস অপেক্ষাও নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি আমাদের অধিকতর চমৎকৃত করে। কালকেতু ব্যাধ ও তার ভেরাণ্ডার থামের কুঁড়ে ঘরের ছেঁড়া কাঁথা, বাসি মাংসের পসরা ও ব্যাধবালাদের দুর্গন্ধযুক্ত পরিধান কবি যেন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যথাযথ রূপ দিয়েছেন। ধনপতির কাহিনীতেও কবি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। অনেক ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনাও তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। এগুলির সহজ, সরস ও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তবে স্বাভাবিক বর্ণনাকে শিল্পরূপ দেবার জন্য যে পরিমিতিবোধ, কল্পনার ঐশ্বর্য দরকার, দ্বিজমাধবের তা ছিল না। কবিত্বশক্তিতে ন্যূন হলেও কিন্তু চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর ক্ষমতাকে খর্ব করা যায় না। মুকুন্দরাম ব্যাধ কালকেতুকে সুন্দর-ভাবে চিত্রিত করলেও রাজা কালকেতুর চরিত্র ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন। তাঁর কালকেতু কলিঙ্গরাজের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে স্ত্রীর বুদ্ধিতে কাপুরুষের ন্যায় ধান্যঘরে লুকায়—'লুকাইল বীর ধান্যঘরে'। কিন্তু দ্বিজমাধব কালকেতুর চরিত্রে আগাগোড়া সঙ্গতি রেখেছেন। ফুল্লরা স্বামীকে যুদ্ধ থেকে বিরত হতে অনুরোধ করলে কালকেতু 'কোপে কাঁপে থরথর'। ফুল্লরাকে বলে—

বলি দিব কলিঙ্গ রায় তুষিব চণ্ডিকা মায়
আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড।

কলিঙ্গরাজের কাছে বন্দী হয়েও কালকেতু উন্নতশির—'রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে'। শঠ ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটিও সুপরিকল্পিত এবং সুচিত্রিত। ভাঁড়ুর স্বার্থপরতা, ছলচাতুরী ও প্রতারণা কবি বেশ উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত করেছেন। কালকেতুর আদেশে মাথা মুড়িয়ে ভাঁড়ুকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে ভাঁড়ু গঙ্গাপারে পালিয়ে গিয়ে বলে বেড়াতে

লাগল 'গঙ্গাপারে গিয়া মুড়াইয়াছি মাথা।' ভাঁড়ুদত্তের এই সামান্য উক্তিতেই তার চরিত্রের অসামান্য স্বরূপটি আশ্চর্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন—"মুকুন্দের কাব্যের প্রায় সমস্ত অংশই মাধুর চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট। উহাতে আখ্যানবস্তুর বর্ননা, কাব্যাংশ, ঘটনাবৈচিত্র্য প্রভৃতি সকল গুণেরই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী ; মাধুর ভাঁড়ুদত্ত, কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত হইতে শঠতায় প্রবীণ।"

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবিকথা॥ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী শুধু চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর শ্রেষ্ঠ কবি নন, সমগ্র মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্য আধুনিক-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে—কিছু বৈষ্ণব কবিতা বাদ দিলে—সাহিত্য ও শিল্পের বিচারে সবচেয়ে উল্লেখ্য রচনা। প্রচলিত অখ্যানবৃত্তের নির্দিষ্ট কাঠামোতে তিনি যে অভিনব ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা তাঁর সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন। প্রথানুবর্তনে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেও কবি তার আড়ালে রক্তমাংসের বাস্তব মানুষের যে বিশিষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতেই তাঁর মানসিকতার অনন্যতা নিহিত। মধ্য যুগের বিপুলায়তন মঙ্গলকাব্যধারায় অজস্র কবির সমাবেশ—কিন্তু মুকুন্দরামের এই দৃষ্টিভঙ্গী কারোরই আয়ত্ত ছিল না। মুকুন্দরামের কবিচিত্ত আপনার অকৃত্রিম সহৃদয়তা ও সূক্ষ্ম বাস্তব-দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছে মানুষের চরিত্র আর মানবতার মহিমা। এই একটিমাত্র কারণে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন চিরকালের জন্য পাতা থাকবে। "বাংলা সাহিত্যে তিনি স্ফুটনোন্মুখ মানবতার প্রথম কবি, প্রথম আধুনিক কবি—যখন আধুনিক কাল অনাগত, যখন মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা অনাবিষ্কৃত।"

ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য-রচয়িতা মুকুন্দরামের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, খুবসম্ভব তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ধমানের দামুন্যাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মুকুন্দরামের কাব্যের প্রকৃত নাম 'অভয়ামঙ্গল'। কবি ভণিতায় এই নামই বেশী ব্যবহার করেছেন। তবে 'চণ্ডীমঙ্গল' নামেই কাব্যটি পরিচিত হয়ে আসছে। 'শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান' বলে মাঝে মাঝে যে ভণিতা দিয়েছেন, তা কবির প্রাপ্ত উপাধি মনে হয়। এজন্যই তাঁর রচনা 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী এবং কবি 'কবিকঙ্কণ' মুকুন্দরাম চক্রবর্তী নামে সমধিক পরিচিত। মুকুন্দরাম যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকেই তাঁর বাসস্থান, বংশ পরিচয় ইত্যাদি সব জানা যায়। আত্মকাহিনী দুটি মিলে—একটি ছাপা হয়েছে আর একটি ছাপা হয়নি। আমরা এখানে ছাপা আত্মকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি—

বর্ধমানে রত্না নদীর তীরে দামুন্যা গ্রামে কবির কয়েক পুরুষের বাস ছিল। কবিরা

চক্রাদিত্য শিবের পূজারী হলেও কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র বৈষ্ণব ছিলেন। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। চাষবাস ছিল তাঁদের প্রধান জীবিকা। দামুন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর জমি তাঁরা ভোগ করতেন। এর মধ্যে প্রজার পাপের ফলে অধর্মী রাজার অধিকার হল এবং গৌড়-বঙ্গ-উৎকলঅধিপ মানসিংহের আমলে দামুন্যার ডিহিদার হল মামুদ সরিফ। তাঁর অত্যাচারে দামুন্যার অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর তালুক বাজেয়াপ্ত হল। তিনি কয়েদ হলেন।

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সাতপুরুষের বাস্তুভিটার মায়া ছেড়ে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে কবি পথে বার হলেন। গ্রাম ছেড়ে কিছুদূর গেছেন, পথে ডাকাত রূপরায় সব কেড়েকুড়ে নিল। সর্বস্বান্ত কবি যদু কুণ্ডু নামক জনৈক সহৃদয় তেলির বাড়িতে আশ্রয় পেলেন।

দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।

তিন দিন পরে কবি আবার যাত্রা করলেন। পথে পড়ল মুড়াই নদী (আধুনিক মুণ্ডেশ্বরী)। তা পার হয়ে ভেড়ুটিয়া গ্রাম ছাড়িয়ে দ্বারকেশ্বর নদী পার হয়ে পৌছলেন বাতনগিরি। এই গ্রাম ছেড়ে আরও কয়েকটি নদী পার হয়ে কবি গোচড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য কবি বিশ্রাম নিলেন। স্নানের তেল নেই, ক্ষুধার অন্ন নেই, এদিকে 'শিশু কাঁদে ওদনের তরে'। কবি কোনরকমে রুক্ষ কেশে স্নান করে শালুক ফুল দিয়ে সঙ্গে আনা গৃহদেবতার পূজা করলেন, পূজার নৈবেদ্য হল 'শালুক-পোড়া'। পূজার শেষে ক্ষুধাতৃষ্ণায়, পরিশ্রমে ক্লান্ত কবি ঘুমিয়ে পড়লেন সেখানে। স্বপ্ন দেখলেন, দেবী তাঁর শিয়রে বসে তাঁকে কাব্য রচনা করতে বলছেন—

মা কৈল পরম দয়া দিল চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিল রচিতে কবিত্ব।

এই স্বপ্নকে কবি দেবী-আজ্ঞা বলে শিরোধার্য করে আবার শুরু করলেন পথ চলা। শিলাই নদী পার হয়ে বহু কষ্ট ভোগ করে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পেলেন। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে কবি সেখানে থেকে গেলেন।

স্থধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশুপাশে কৈল নিয়োজিত।

বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রায় রাজা হল। দূর হল কবির দুঃখকষ্ট। জীবনে

এল আর্থিক সচ্ছলতা। কবি দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা ভুলেই গেলেন। এর মধ্যে কবির একটি পুত্রসন্তান মারা গেল। দেবীর কোপে এই অঘটন ভেবে এবং সেই সঙ্গে ছাত্র-রাজা রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে কাব্য-রচনায় মন দিলেন। লেখা হল কবির 'নৌতুনমঙ্গল'।

কবির আত্মকাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। এতে কবির জীবনকথা ছাড়াও বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি সুন্দর পরিচয় মেলে। সাহিত্যরসেও রচনাটি উজ্জ্বল। মুকুন্দরামের এই বিস্তৃত আত্মপরিচয়দানের রীতি পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যের কবিমাত্রেই অনুসরণ করেছেন।

কাব্যরচনা-কাল॥ কবি বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিলেও কাব্যরচনা-কাল সম্পর্কে কোন উল্লেখই করেননি। পণ্ডিতদের মধ্যে কাব্যের রচনা-কাল নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়েছে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। মোটামুটিভাবে কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল, এটুকু বলা চলে।

কাব্যকথা॥ মুকুন্দরাম পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে-অলঙ্কারে তাঁর অধিকার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এই পাণ্ডিত্য তাঁর কবিত্বের সহজ স্ফূর্তিতে বাধা সৃষ্টি করেনি বরং কাব্যশ্রী বাড়িয়েছে। যেমন—

তৈল বিনা কৈল স্নান করিনু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।

প্রায় অপ্রচলিত সংস্কৃত 'উদক' ও 'ওদন'-এর প্রয়োগ ছত্র দুটিতে এক অপূর্ব ধ্বনি-সুষমার সঞ্চার করেছে যা সহজ সমার্থক শব্দ 'জল' ও 'অন্ন'-এর ব্যবহারে ঘটত না, ধারণা। শব্দসংগ্রহে ও শব্দযোজনায়, অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে এবং বর্ণনার যথাযথতায় তাঁর রচনা সর্বত্রই সমৃদ্ধ।

নিপুণ পর্যবেক্ষণ ও সহৃদয়তার গুণে কবি অতি তুচ্ছ উপাদানকে করে তুলেছেন উপভোগ্য। বাস্তবরসকে জীবনরসের সঙ্গে মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্য। গুজরাট নগরে সমাগত মুসলমানজীবনের একটি চিত্রাংশের বর্ণনা করে মুকুন্দরাম লিখেছেন—

ফজর সময়ে উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নামাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥—ইত্যাদি

এ বর্ণনা যেমন সরস, তেমনি জীবন্ত এবং বাস্তব। জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ, যে জীবনরসরসিকতার পরিচয় এখানে পাই, বাংলা সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নতুন। ফুল্লরার

'বারমাস্যা' ধরাবাঁধা বিষয়।* কিন্তু তাতেও কবির সৃষ্টিশীলতা এক নতুন আস্বাদ এনেছে। কল্পনাশক্তির গুণে কবি গতানুগতিক বিষয়কে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন।

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীএ মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদরদহনে॥

বাসন্তী প্রকৃতির পটে প্রেমাবেশবিহ্বল নর-নারীর প্রথানুগ বর্ণনাই কবি দিয়েছেন। কিন্তু এরই ফাঁকে ক্ষুধাতুরা দরিদ্রা ব্যাধ রমণীর দুঃখকারুণ্যের আর্তি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতেই তাঁর কবিকীর্তির মহিমা। দরিদ্র মানুষের সুখদুঃখের প্রতি তাঁর মমতা ছিল সর্বাধিক। কেউ কেউ তাঁকে 'দুঃখের কবি' বলেছেন। বাস্তবিক তাঁর কাব্যে দুঃখদারিদ্র্যের ছবিগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। সেখানে কাল্পনিকতার অবকাশ নেই। দুঃখদারিদ্র্যের বর্ণনায় ও করুণরস-সৃজনে মুকুন্দরাম অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন।

সহজ স্নিগ্ধ প্রসন্ন কৌতুকরসে কবির কাব্য আগাগোড়া মোড়া। জীবনে বহু দুঃখকষ্টের আঘাতে কবিহৃদয় জর্জরিত হলেও কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত বেদনার ছায়াপাত ঘটেনি। স্মিতহাস্যে পৃথিবীর সব দুঃখ-তাপ কবি যেন হেলাভরে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর ভাষায় নেই খরদীপ্ত ব্যঙ্গ—আছে কমনীয় মধুরতা। দেবীর কাছে কালকেতু-অত্যাচারিত ভালুকটি যখন দুঃখ নিবেদন করে বলে—

উইচারা খাই বনে নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না রাখি তালুক॥

—তখন মানবসমাজের প্রতি তির্যক ব্যঙ্গটুকু প্রসন্ন হাসিতে সরস কমনীয় হয়ে ওঠে। চালকলা-বাঁধা ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ তিক্ততা প্রকাশ পেলেও কঠিন ব্যাধি দেখে বৈদ্যদের পলায়নে কবি নম্র উচ্চহাস্য করেছেন—

অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়।

লক্ষণীয়, সমাজ ও পরিবেশের প্রতিটি ঘটনাচিত্রকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির রঙে মেজে নিয়ে রসসৌন্দর্যে ভাস্বর করে তুলেছেন।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মহান রূপকার মুকুন্দরামের শিল্পকৃতির বিশিষ্টতা বা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় চরিত্রচিত্রণে। সার্থক চরিত্রস্রষ্টার ব্যাপক জীবন-অভিজ্ঞতা ও বাস্তব চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা—এ দুয়ের নিপুণ অধিকারী হওয়া চাই। মুকুন্দরাম জীবনে বহু দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর বাস্তবজ্ঞান ও তীক্ষ্ণ

* নায়কনায়িকার বার মাসের বিরহবেদনার বর্ণনাই 'বারমাস্যা'। এখানে দুঃখকষ্টের কথা বোঝাচ্ছে।

দৃষ্টি ছিল। এ কারণেই চরিত্রচিত্রণে সাফল্যের সীমাকে তিনি ছুঁয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন, ধারণা। দু-একটি চরিত্র ছাড়া তাঁর সব কটি চরিত্রই পূর্ব কাব্য-ঐতিহ্য থেকে আহৃত, ফলে তা একই ধরণের, একই ছাঁচের। ব্যক্তিত্বের প্রকাশেই একটি চরিত্র আর একটি চরিত্র থেকে আলাদা হয়, তার বিশিষ্টতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুকুন্দরামের কৃতিত্ব, তিনি একই ছাঁচের চরিত্রগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সীমাবদ্ধ হলেও ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুকুন্দরামের কালে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ আসেনি। আধুনিক কালের ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চরিত্র তাঁর কাব্যে আশা করা বৃথা। তবুও সে যুগের তুলনায় তাঁর কাব্যে যা পাই, তা অভাবনীয়। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে ওঠে, তাই ব্যক্তি। এই 'ব্যক্তির' প্রকাশ তাঁর প্রায় প্রতিটি চরিত্রেই লক্ষণীয়।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশদ করছি—দেবীর কৃপায় সাত ঘড়া ধন পেয়েছে কালকেতু। কিন্তু একা বাড়ী বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই দেবীকেও এক ঘড়া ধন বয়ে দেবার অনুরোধ করল। দেবী ভক্তের অনুরোধে ধনঘড়া কাঁখে নিয়ে কালকেতুর পিছনে পিছনে চললেন। কালকেতুর আশঙ্কা দেবী ধনঘড়া নিয়ে না পালান, তাই সে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখে দেবী ঠিকমত আসছেন কিনা—

পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগু কালু যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছু পানে চায়॥
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধনঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী॥

স্থূলবুদ্ধি, অমার্জিত মনোবৃত্তির অধিকারী কালকেতুর ব্যাধসুলভ ব্যক্তিপ্রকৃতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে কবি নিখুঁত ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে। ঠিক এভাবেই তাঁর অঙ্কিত লহনা-খুল্লনা-ফুল্লরা, মুরারিশীল, ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলি আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, জীবন্ত হয়েছে। মুরারি শীলের চরিত্র মুকুন্দরামের স্বকপোলকল্পিত এক অমর সৃষ্টি। অতি তুচ্ছ দুটি পঙ্‌ক্তি—

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল॥

—কিন্তু এরই সাহায্যে ধূর্ত প্রবঞ্চক এই মুরারি শীলের চরিত্র জীবন্ত, স্পষ্টরেখ করে তুলেছেন। এবংবিধ কবিকীর্তি মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্তও বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। শঠতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি ভাঁড়ুও ধূর্ত, মুরারিও ধূর্ত। তবে এ দুয়ের ধূর্ততা এক নয়। মুকুন্দরামের কবিমানস আশ্চর্যভাবে এ দুয়ের ব্যক্তি-চেহারায় পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছে। চরিত্রে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আরোপ তাঁর

বিশেষ সৃষ্টিশীলতার পরিচায়ক—যা আধুনিক সাহিত্যের সীমাভুক্ত। তাই কোন কোন সমালোচক তাঁর রচনায় উপন্যাসের লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন। কেউ বা বলেছেন, 'দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।'

বাস্তবিক মুকুন্দরাম ছিলেন জীবনরসরসিক, তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল নিপুণ, সহানুভূতি ছিল গভীর। কাহিনীর পরিকল্পনায় তিনি পূর্বসূরীদের কাছে ঋণী হলেও আপন কল্পনাশক্তি ও রচনাশক্তির গুণে তাতে রেখেছেন 'অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা-প্রজ্ঞা'র স্বাক্ষর। মঙ্গলকাব্যের তিনি প্রকৃত সার্থক শিল্পী। ভাব ও ভাষার সংযমে, কল্পনার দীপ্তি ও ঐশ্বর্যে, মণ্ডনশ্রী ও রসোৎকর্ষে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। তাঁর উদ্দেশ্যে মহাকবি মধুসূদনের 'কবিতা-পঙ্কজ-রবি' বলে প্রণতিজ্ঞাপন যথার্থই সঙ্গত।

শ্রীচৈতন্যজীবনী-সাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয়

শ্রীচৈতন্যজীবনী-সাহিত্য মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকে উপজীব্য করে যে সাহিত্য রচিত, তাই শ্রীচৈতন্যজীবনী-সাহিত্য নামে পরিচিত। বাস্তব মানুষকে অবলম্বন করে সাহিত্যরচনা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে ঘটেনি। সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য এ জাতীয় কাব্যরচনার দৃষ্টান্ত আছে। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' তার উজ্জল নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে এ ধারার প্রবর্তন শ্রীচৈতন্যকে নিয়েই। শ্রীচৈতন্যদেবের দেবোপম চরিত্রমাধুর্যই এই জী বনী-সাহিত্য রচনার প্রেরণার কারণ এবং তাঁর জীবনকাহিনী নিয়েই বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব ও আধুনিক যুগের লক্ষণাক্রান্ত জীবনীসাহিত্যের সূত্রপাত। পাশ্চাত্ত্য জীবনচরিতের আদর্শে (Biography) চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যের বিচার করলে হয়তো এগুলিকে যথার্থ জীবনচরিত বলা যাবে না। জীবনীতে বাস্তব ঘটনার যথাযথ বিবরণ থাকা প্রয়োজন। রক্তমাংসের মানুষের জীবনের ভালমন্দ সব কিছু নিয়ে তার পূর্ণ ছবিটি ফুটে ওঠা দরকার। আদর্শ জীবনচরিত রচনার মূল কথা—'he will be seen as he really was'। অনৈতিহাসিক, অলৌকিক কোন কিছু তথ্যই আদর্শ জীরনচরিত গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাবে না। সেদিক থেকে বিচার করলে চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যগুলি যথার্থ জীবনী-সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। এতে বাস্তব বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। তাছাড়াও, ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয়নি, তথ্যের বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে এবং যুক্তি প্রমাণের কষ্টিপাথরে সব কিছু বিবরণ যাচাই করা হয়নি। এগুলিতে বিচারনিষ্ঠা অপেক্ষা কবিদের আপন আপন ভক্তিবিশ্বাস বড় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য জীবনীকারেরা প্রধানত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই জীবনীকাব্যগুলি লিখেছেন। সেই ধর্মপ্রচারকে মুখ্য করতে গিয়ে তাঁরা বাস্তব-অবাস্তবের ইতিহাসের বিচারবিবেচনায় কোনরূপ মনোযোগ দেননি। শ্রীচৈতন্যের কার্যকলাপ তাঁদের চোখে দেবলীলারূপেই প্রতিভাত হয়েছে এবং ফলে শ্রীচৈতন্যের মানবরূপ আঁকায় ব্রতী হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐশ্বরিকরূপ আঁকায় উৎসাহ বোধ করেছেন। আর একারণে জীবনীকাব্যগুলি 'চরিতসাহিত্য' না হয়ে ভগবানরূপী শ্রীচৈতন্যের 'চরিতামৃত' হয়ে উঠেছে। তবুও আমাদের স্বীকার করতে হবে, বৈষ্ণবকবিরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের লক্ষ্য থেকে সরে গেলেও বাস্তব মানুষের জীবনকথা রচনার ধারা প্রবর্তন করে এক অভিনব সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। দেবদেবীর মাহাত্ম্য গান শোনাই যে-কালে মানুষের একমাত্র মানসিকতা ছিল, ধর্মীয় কুহেলিকায় মানুষের দৃষ্টি যে-কালে সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই কালের পরিমণ্ডলে মানুষের কীর্তি-গান রচনা করে তাঁরা এক বৈপ্লবিক, দুঃসাহসিক দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছিলেন। চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যের এখানেই গুরুত্ব নিহিত।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরই তাঁর যে-সব জীবনী রচিত হয়, তা প্রথমে সংস্কৃতে লিখিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আদি-চরিতকার খুবসম্ভব স্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্ত। স্বরূপ দামোদরের রচনা না পাওয়া যাওয়ায় আদি জীবনীকারের সম্মান মুরারি গুপ্তেরই প্রাপ্য। মুরারি গুপ্তের কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'। সংক্ষেপে এটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত। মুরারির পরে উল্লেখযোগ্য কবি কর্ণপূর। এঁর প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। কর্ণপূর চৈতন্যের জীবন নিয়ে সংস্কৃতে একটি কাব্য ও একটি নাটক রচনা করেন। কাব্যের নাম 'চৈতন্যচরিতামৃতম্'। নাটকের নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'।

সংস্কৃতে রচিত চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলিকে বাদ দিলে বাংলা ভাষায় রচিত বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রধান চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ।

বৃন্দাবনদাস

কবিকথা॥ বৃন্দাবনদাস বাংলা ভাষায় চৈতন্যজীবনী রচনার প্রথমতম লেখক। সমসাময়িক মানুষকে নিয়ে কাব্যরচনা--শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, সমস্ত আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যে অভাবিতপূর্ব। সেদিক থেকে বৃন্দাবনদাস অসাধারণ গৌরবের অধিকারী। তাঁর পিতৃপরিচয় জানা যায়নি। মাতা নারায়ণী দেবী বালবিধবা ছিলেন। ইনি সুবিখ্যাত শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই কবির জন্ম হলেও শ্রীচৈতন্যকে দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর ঘটেনি ধারণা। তাই তিনি আক্ষেপ করেছেন—

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইয়াও বঞ্চিত সে মুখ দরশনে॥

এ থেকে মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের নীলাচলবাসকালে তাঁর জন্ম হয়। খুবসম্ভব কবি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের অনুগত শিষ্য ছিলেন। তাঁরই আদেশে ও উৎসাহে তিনি চৈতন্যদেবের জীবনী-রচনায় প্রবৃত্ত হন।

বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যজীবনের প্রথমে নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে এই নামের উল্লেখ আছে। পরে এই নাম বদলে চৈতন্য-ভাগবত রাখা হয়। একমতে, লোচনদাসের কাব্যের নামও চৈতন্যমঙ্গল থাকায় মায়ের নির্দেশে বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যের নাম বদলে চৈতন্যভাগবত রাখেন। আবার অন্যমতে, বৃন্দাবনের ভক্তেরা ভাগবতের কৃষ্ণের জীবন-ছাঁচে চৈতন্যের জীবন আঁকা হয়েছে বলে গ্রন্থটির নাম চৈতন্যভাগবত রাখেন।

বৃন্দাবনদাস শেষ বয়সে বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে এসে বাস করেন। একটি মন্দির ও শ্রীবিগ্রহের তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আজীবন চিরকুমার ছিলেন। খুবসম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর মৃত্যু হয়।

কাব্য-রচনাকাল ॥ চৈতন্যভাগবত ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল তা ঠিক বলা সম্ভব নয় কারণ বৃন্দাবনদাস কোন সন-তারিখের উল্লেখ করেননি। কাব্যটির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোটামুটিভাবে কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল নিশ্চিতভাবে বলা চলে।

কাব্যকথা ॥ বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ও আদরণীয় গ্রন্থ নেই। চৈতন্যভাগবতের যত পুথি মেলে, তত আর কোন বৈষ্ণব গ্রন্থের মেলে না। সরল পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে লিখিত সুললিত কাব্যটি অতি সুখপাঠ্য। চৈতন্যের জীবনকথা নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি চৈতন্য-পরিকরবর্গের মুখ থেকে তিনি শুনে থাকবেন। মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকেও তিনি বহু তথ্য আহরণ করেছিলেন। গ্রন্থটি আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—প্রতি খণ্ড আবার অনেকগুলি অধ্যায়ে ভাগ করা। আদি খণ্ডে গৌরাঙ্গের জন্ম, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, বিবাহ ও গয়া-গমন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত। মধ্য খণ্ডে কীর্তনানন্দে বিহ্বল ভাবময় গৌরাঙ্গের এক বৎসরকালের নবদ্বীপ-লীলা ও সন্ন্যাস-গ্রহণের বর্ণনা রয়েছে। অন্ত্য খণ্ডে সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে গমন এবং নীলাচল-বাসকালীন কতিপয় ঘটনা বিবৃত হয়েছে। চৈতন্যজীবনের শেষ ভাগের পরিচয় এতে খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। কাব্যের সমাপ্তি আকস্মিক। এজন্য কারো কারো ধারণা, কবি কাব্য-রচনাকালেই দেহত্যাগ করে থাকবেন।

চরিতগ্রন্থ হিসেবে বিচার করলে দেখা যাবে, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের জীবনকে একটি বিশেষ আদর্শের দৃষ্টিতে দেখেছেন। চৈতন্যদেব যেন পাপে পূর্ণ পৃথিবীর ভূভারহরণের জন্য কলিকালে অবতীর্ণ নররূপী স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য যে অভিন্ন তা প্রতিপন্ন করার জন্য কৃষ্ণলীলার অনুরূপ করে চৈতন্যজীবনের ঘটনা-গুলিকে সাজিয়েছেন। ভাগবতের আদর্শে তিনি চৈতন্যদেবের জীবনকথাকে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। ফলে কৃষ্ণের বাল্যকালে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল, চৈতন্যের বাল্য-কালেও সে-সব ঘটনা দেখানো হয়েছে। অবশ্য এর ফলে চৈতন্যের মানবিকরূপটি ঢাকা পড়লেও তা সম্পূর্ণ আবৃত হয়নি। চৈতন্যদেবের বাল্যকালের দুরন্তপনা, প্রথম যৌবনের উদ্ধত, অবিনয়ী রূপ এবং উজ্জ্বল পাণ্ডিত্য চমৎকার ব্যক্তিমূর্তিতে ধরা পড়েছে। শিশু চৈতন্য মায়ের আদেশে অগ্রজকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে চলেছে, তার একটি বর্ণনা এরূপ—

দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর॥
ভোজনে আইসহ ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥

এ যেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিত্য-দেখা ধূলি-ধূসরিত শিশুর শুভ্র পবিত্র ছবি। চৈতন্যভাগবতের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠা গৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপের আলেখ্যে পূর্ণ। চৈতন্যচিত্রণে ভক্তির সঙ্গে সহজ কবিত্ব এসে মিলিত হয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেন—"শ্রীচৈতন্যের চরিত্র কবিকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে, সুবৃহৎ কাব্যটির মধ্যে কবির লেখনী যেন কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। কবিত্ব ফলাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই, তথাপি চৈতন্য-চরিত্রের অপরিসীম মাধুর্য এবং কবির অন্তরের স্বতঃউৎসারিত ভক্তিরস চৈতন্যভাগবতে অকৃত্রিম কাব্যের দীপ্তি দান করিয়াছে।"

শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা হিসেবে এ রচনার গুরুত্ব যেমন অসাধারণ, তেমনি তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচায়িকা হিসেবে এর মূল্য অপরিসীম। নবদ্বীপের সমৃদ্ধি, বিদ্যাচর্চা, মঙ্গলচণ্ডীর গীত আর জাগরণ, 'দম্ভ করি বিষহরি পূজা', বহু ধন দিয়া পুত্তলী নির্মাণ প্রভৃতির বিবরণ বৃন্দাবনদাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিয়েছেন—

ধর্মকর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥

বৃন্দাবনদাসের কাব্য থেকে তখনকার দিনের অন্ধবিশ্বাস, লোচাকার ও স্ত্রী-আচার আমোদপ্রমোদ, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। এই ইতিহাস-নিষ্ঠরতার জন্য ঐতিহাসিকের কাছে চৈতন্যভাগবতের মূল্য অপরিমেয়।

বর্ণনার পরিচ্ছন্নতা, কারুণ্য, বেদনার আবেগ-আতুরতা ইত্যাদি প্রকাশে তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, চৈতন্য সন্ন্যাস নিলে শচীমাতা বিলাপ করে বলেছেন—

না যাইহ না যাইহ বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছয়ে সবে তোর মুখ চাইয়া॥…
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে প্রাণ মুই সর্বদা ছাড়িমু॥

এখানে সহজ স্বচ্ছ নিরলঙ্কৃত কয়েকটি কথায় মাতৃহৃদয়ের বেদনা অপরূপ কারুণ্যে

চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত এই সহজ কবিত্ব ও ভক্তিরসের প্রগাঢ়তার জন্য বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ সমাদর পেয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর রচনায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে বৃন্দাবনদাসের উল্লেখ করেছেন—

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥

উত্তরসূরীর কাছে এরূপ অভ্যর্থিত হওয়ার মত গৌরবজনক আর কিছু নেই। চৈতন্য-ভাগবতে চৈতন্য-জীবনের শেষ ভাগের পরিচয় নেই। তাঁর রচনার এই অপূর্ণতা-ই অনতিভবিষ্যতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়নে কারণ হয়েছিল।

বহু গুণের আকর চৈতন্যভাগবতের দু-একটি ত্রুটি নির্দেশ করা চলে। প্রথমত, ঘটনার ক্রম সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, অলৌকিক ঘটনার অপ্রচুর সমাবেশ ঘটায় বাস্তবতা ক্ষুন্ন হয়েছে। তৃতীয়ত, কবি চৈতন্যঘোষিত ও নির্দেশিত বৈষ্ণবের সেই সুবিখ্যাত আচরণবিধি—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা' (অর্থাৎ তৃণের চেয়েও নীচু হবে এবং তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হবে) নিজের জীবনে মেনে চলেননি। কবি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের আচরণে বৈষ্ণবোচিত বিনয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অত্যন্ত অশালীনভাবে বলেছেন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥

বিশেষ চৈতন্যভক্ত একজন বৈষ্ণবের মুখে এ উক্তি বিসদৃশ ঠেকে। এ জাতীয় সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বাদ দিলে চৈতন্যভাগবত নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনকাব্য।

লোচনদাস

কবিকথা॥ লোচনদাস অন্যতম খ্যাতনামা চৈতন্যজীবনীকার। কবি তাঁর চৈতন্য মঙ্গলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তা থেকে জানা যায়, বর্ধমানের কোগ্রাম ছিল তাঁর নিবাস। পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী। কবি বৈদ্যবংশসম্ভূত ছিলেন। পিতৃকুলে একমাত্র বংশপ্রদীপ বলে আদরযত্নে কাল কেটেছিল, ফলে লেখাপড়ায় মনোযোগী হননি। মাতামহের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখেন। এবং সেই শিক্ষার বলে উত্তরকালে চৈতন্যমঙ্গল লিখতে সক্ষম হন। বৃন্দাবনদাসের সমসাময়িকালে কবি বর্তমান ছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে কবি সাক্ষাৎ দেখননি, অনুমান। অল্প বয়সে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সহচর নরহরি সরকারের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং গুরুদেবের কৃপাতেই চৈতন্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। নবদ্বীপ-লীলাপ্রসঙ্গে নরহরি সরকারের নাম চৈতন্যচরিতকারদের কেউই উল্লেখ করেননি। একমাত্র লোচনই তাঁর কাব্যে

এঁর নাম উল্লেখ করেছেন। আনুমানিক ১৫৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এছাড়া, কবি অনেক পদও রচনা করেছেন, এগুলি লোচনদাসের 'ধামালী' নামে বিখ্যাত।

কাব্যকথা॥ চৈতন্যমঙ্গল—সূত্র খণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড ও শেষ খণ্ড—এই চার খণ্ডে বিভক্ত। সূত্র খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব প্রমাণিত হয়েছে। আদি খণ্ডে চৈতন্যের জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিবরণ, মধ্য খণ্ডে গয়া-প্রত্যাগত গৌরাঙ্গের ঐশ্বরিক ভাবোন্মেষ, সন্ন্যাস-গ্রহণ, নীলাচল-যাত্রা ও সার্বভৌম উদ্ধার-কাহিনী এবং শেষ খণ্ডে তাঁর শেষ জীবন বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বহু ঘটনার উল্লেখ থাকলেও এর সবগুলিই যথার্থ নয়। মুরারি গুপ্তের কড়চাকে প্রধানত অনুসরণ করেছেন, তবে লোকমুখে শ্রুত গল্পকাহিনীও যথেষ্ট স্থান পেয়েছে। এভাবে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায় চৈতন্যের প্রকৃত জীবন-পরিচয় এতে ফুটে ওঠেনি। ফলে এর ঐতিহাসিক মূল্য তেমন নেই। চৈতন্যজীবনের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে গৃহীত না হলেও এর অনেক স্থানে সুমধুর কবিত্বের প্রকাশ ঘটেছে, সন্দেহ নেই। চৈতন্যদেবের অপর কোনও চরিতকাব্য এত মনোরম ভাষায়, এত সুন্দর কবিত্বের সুষমায় মণ্ডিত হয়ে রচিত হয়নি। চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদে বিষ্ণুপ্রিয়ার যে আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে গীতিকবিতার অপরূপ সুর ঝঙ্কৃত—

কি কহিব মুই ছার আমি তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাব বিষ খাইয়া
সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর কিশোরী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রেম-সম্পর্কের কথা আর কোন চৈতন্যজীবনীতে নেই, এদিক থেকে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোধান বিষয়ে একটি নতুন তথ্য মেলে। তা হল এই—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

—এ কাহিনীর সত্যতায় বিশ্বাস করা শক্ত।

রাগরাগিণীর উল্লেখ থাকায় মনে হয়, মঙ্গলকাব্যের মত এটি গাওয়া হত।

জয়ানন্দ মিশ্র

কবিকথা॥ জয়ানন্দ মিশ্র চৈতন্যজীবনী নিয়ে একটি কাব্য রচনা করেন। কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'। জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা

যায়, বর্ধমানে আমাইপুরা গ্রামে বাস ছিল। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনী দেবী। জয়ানন্দের নাম ছিল 'গুইঞা'। জয়ানন্দ যখন নিতান্ত শিশু শ্রীচৈতন্য তখন তাঁদের বাড়ীতে আসেন। 'গুইঞা' এই নাম পরিবর্তন করে তিনি কবির নাম 'জয়ানন্দ' রাখেন। তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ থাকায় অনুমান যে, ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি কাব্যটি রচনা করেন।

কাব্যকথা॥ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পালাগানের আদর্শে নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। রচনারীতি অনেকটা মঙ্গলকাব্যের মত। এতে আদ্যাশক্তির বন্দনা আছে, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের পক্ষে যা করা কঠিন। জন-মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে চৈতন্যজীবন-অতিরিক্ত নানা পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন, যথা—ধ্রুবচরিত্র, জড়ভরত, জুয়াড়ীর অ্যাখান, অজামিলের উপাখ্যান ইত্যেদি। জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দেবার জন্য নানাস্থানে চৈতন্যর মুখ দিয়ে সংসারের অনিত্যতা, বৈরাগ্যের মহিমা ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক চৈতন্যজীবন-রচনার প্রতি কবির কোন আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর রচনায় বহু অভিনব তথ্য রয়েছে। তবে এসবের যাথার্থ্যে বিশ্বাস করা কঠিন।

জয়ানন্দের প্রদত্ত দু-একটি তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। চৈতন্যকথার প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন বাংলাদেশের বিশেষ করে নবদ্বীপের যে ছবি এঁকেছেন, তার প্রমাণিকতায় বিশ্বাস করা চলে। নবদ্বীপে রাজ-অত্যাচরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যথার্থ। চৈতন্যের তিরোধান-সম্পর্কিত যে তথ্যটি দিয়েছেন, তা পণ্ডিতেরা খাঁটি তথ্য বলেই মনে করেন। জয়ানন্দ বলেছেন, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নৃত্য করতে গিয়ে চৈতন্যের পায়ে একটি ইটের টুকরো বিঁধে যায় এবং তা থেকে পা বিষাক্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে—

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজল বাম পাএ আচম্বিতে ॥—
চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শরণ অবশেষে ॥…
মায়া শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছ ড়ি ॥

উল্লেখ্য, আর কোন চৈতন্যচরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কাব্য হিসেবে এ রচনা অকিঞ্চিৎকার। তবুও রচনাটি থেকে মোটামুটি চৈতন্যের লীলামাধুর্য আস্বাদন করা চলে। বাল্যক্রীড়ারত চৈতন্যের বর্ণনায় দু-এক ক্ষেত্রে বাৎসল্য-রসের অভিব্যক্তি উপভোগ্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কবিকথা ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীকার, পুরাতন বাংলা সাহিত্যের মহাকবি। তাঁর রচিত চৈতন্যচরিতামৃত কেবল শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজবনীগ্রন্থ হিসেবে নয়, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যেরও মহাগ্রন্থ হিসেবে তুলনারহিত। বিরল কবিপ্রতিভার বিচিত্র ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ এরকম গ্রন্থ মধ্য যুগের সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেও দুর্লভ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। গৌড়বঙ্গ, উৎকল, বৃন্দাবন—এ সমস্ত অঞ্চলের ভক্তিধর্ম ও দার্শনিকতাকে তিনি যে অনায়াসনৈপুণ্যে, সহজ সাবলীলতায় প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর অসাধারণ মনীষার পরিচয় দেয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে। বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। খুবসম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাসের পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল। গৃহে শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিগ্রহ-সেবাদির জন্য একজন পূজারী ব্রাহ্মণও নিযুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে এক অহোরাত্র সঙ্কীর্তনে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন নিত্যানন্দ শিষ্য মীনকেতন দাস। মীনকেতন রামদাস নিত্যানন্দ-বিরোধীদের দ্বারা যথাযোগ্য অভ্যর্থিত হননি। এতে নিত্যানন্দের ভক্ত কৃষ্ণদাস মনে মনে বড়ই বেদনাবোধ করলেন। সেইদিন রাত্রে নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে চিরকুমার কৃষ্ণদাস গৃহ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে গিয়ে রঘুনাথ দাসের সান্নিধ্য এবং রূপ-সনাতনের আশ্রয় পেলেন। সম্ভবত রূপ-সনাতন তাঁকে মদনগোপালের সেবায় নিযুক্ত করেন।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যজীবনের অন্ত্যলীলা, বিশেষতঃ তাঁর শেষ বয়সের দিব্যোন্মাদ অবস্থার পরিচয় ছিল না। তাই বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণদাসকে শ্রীচৈতন্যের শেষ-জীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার অনুরোধ করেন। তাঁদের অনুরোধে অতিবৃদ্ধ বয়সে অন্ধপ্রায় দৃষ্টি নিয়ে জরাশিথিল হাতে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা শুরু করেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ছিল তাঁর প্রধান আলোকদিশারী। এছাড়া চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী রূপ-সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের থেকে এবং স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপূর প্রভৃতির রচনা থেকেও প্রয়োজনমত তথ্য নিয়েছিলেন। গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনি এই রীতির অনুসরণ করেন—বৃন্দাবন যেখানে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করেছেন, সেখানে তিনি বর্ণনা বিস্তৃত করেছেন, আর যেখানে বৃন্দাবনদাস বিস্তৃত, সেখানে তিনি সংক্ষেপে সেরেছেন। এক হিসেবে তাঁর গ্রন্থটিকে বৃন্দাবনদাসের পরিপূরক গ্রন্থ বলা যেতে পারে।

কাব্যরচনা-কাল ॥ চৈতন্যচরিতামৃত কবে রচিত হয়, তাই নিয়ে পণ্ডিতমহলে

নানা মতভেদ আছে। বর্তমানে ছাপা যে বই পাওয়া যায়, তাতে রচনাকাল-জ্ঞাপক একটি সংস্কৃত শ্লোক থাকে। শ্লোকটি থেকে রচনাকাল ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কিন্তু 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে এই শ্লোকের ভিন্ন পাঠ প্রচলিত আছে। তা থেকে দেখা যায় গ্রন্থটি ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। মোটামুটিভাবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এটি রচিত ধরে নিতে পারা যায়।

কাব্যকথা ॥ চৈতন্যচরিতামৃত আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনটি অংশে বিভক্ত। চৈতন্যভাগবতে এই অংশভাগকে 'খণ্ড', এখানে 'লীলা' নাম দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণদাস মহাজীবন-লীলাই বর্ণনা করতে চেয়েছেন। সেদিক থেকে এই 'লীলা'-বিভাগ সার্থক।

আদি লীলায় সতেরোটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্যন্ত জীবনলীলার পরিচয় এ অংশে বিধৃত। এ লীলার বর্ণনা তিনি খুব সংক্ষেপে সেরেছেন। ভক্তিনম্রচিত্তে অনুসরণ করেছেন বৃন্দাবনদাসের প্রদর্শিত পথ। মধ্য লীলায় পঁচিশটি পরিচ্ছেদ। এই লীলায় শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস নেবার পর থেকে নীলাচলে অবস্থান পর্যন্ত ছয় বছরের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এতে আছে দাক্ষিণাত্যে নানা তীর্থ পর্যটন, গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং সাধ্যসাধন-তত্ত্ব-আলোচনা, বৃন্দাবনযাত্রা, প্রয়াগে রূপ ও বারাণসীতে সনাতনকে শিক্ষাপ্রদান, বৃন্দাবনের লুপ্তমহিমার পুনরুদ্ধার ও ভক্তিগ্রন্থ রচনার আদেশসহ রূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ইত্যাদি ঘটনা। অন্ত্য লীলায় কুড়িটি পরিচ্ছেদ। এই লীলায় শ্রীচৈতন্যের শেষ আঠার বছরের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের জীবনের এই শেষভাগের কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ করেননি। কৃষ্ণদাস সেদিক থেকে একটি বিশাল অভাব পূরণ করেছেন। বাহ্যজ্ঞানহীন, কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদী শ্রীচৈতন্যের যে মূর্তি আমাদের মানসপটে আঁকা, রঙে-রেখায় তাকে জীবন্ত করে তুলেছেন কৃষ্ণদাস।

শ্রীচৈতন্যজীবনকথা-বর্ণনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলেও বাস্তবনিষ্ঠ জীবন-চরিত রচনায় কৃষ্ণদাস কিন্তু ততটা আগ্রহ দেখাননি। বস্তুত শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নয়। এর প্রতিপাদ্য সেই চরিতামৃত—প্রেম ও ভক্তির বিগ্রহরূপে রাধা ও কৃষ্ণের যুগলতনুরূপে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আরাধ্য, তারই স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যান। শ্রীচৈতন্যের জীবনী বর্ণনা অপেক্ষা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও তত্ত্বদর্শনের প্রতিষ্ঠাতেই তিনি অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, ব্রহ্মসংহিতা, ইত্যাদি নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উপযুক্ত প্রমাণ-শ্লোক চয়ন করে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এই বৈষ্ণব-ধর্মমত প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। শাস্ত্রপ্রমাণ-সঙ্কলনে ও সেগুলির যথাযোগ্য বিন্যাসে কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্য এবং মনস্বিতার পরিচয় মেলে।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, সাধ্যসাধনতত্ত্ব, রাগানুগাভক্তি, সখীসাধনা প্রভৃতি দুরূহ

মননশীল জটিল তত্ত্বভাবনাকে তিনি যে সহজতায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, তা আমাদের মনে গভীর বিস্ময় জাগায়। বিশেষ করে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব যেভাবে ধাপে ধাপে অনুপুঙ্খ আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা তুলনাহীন। এক একটি সুন্দর উপমার মধ্য দিয়ে কঠিন তত্ত্বকথা এক এক সময়ে কত সহজেই না বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অবিচ্ছেদ্য রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন—

মৃগমদ তার গন্ধে যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

জ্ঞানমার্গের ও ভক্তিমার্গের যারা পথিক, তাদের তুলনাও কি সহজ—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল চুষে প্রেমাম্রমুকুলে॥

কাম ও প্রেমের পার্থক্য দুটি মাত্র ছত্রে অসামান্য প্রকাশ পেয়েছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম॥

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকেই স্পষ্ট—তাঁর ভাষা সহজ, নিরলঙ্কার ও সুষম, কবিত্বশক্তির পরিচয়বহ। অবশ্য কোথাও কোথাও ভাষা নীরস, দুরূহ গদ্যধর্মী হয়ে পড়েছে। বিষয়কাঠিন্যের জন্যই তা হয়েছে। তাছাড়া, দীর্ঘদিন প্রবাসবাসের জন্য তাঁর ভাষায় দুটি-একটি হিন্দী-ফারসী শব্দও ঢুকে পড়েছে। এই হিন্দী-ফারসীর অনুপ্রবেশ কোথাও কোথাও কবিত্ব-হানি ঘটিয়েছে। তবুও স্বীকার করতেই হবে, এরূপ একটি মননপ্রধান দার্শনিক-চিন্তাভারাক্রান্ত গ্রন্থে কাব্যরস-সঞ্চারে তিনি যথোচিত নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষায় তখনো গদ্য আবিষ্কৃত হয়নি, তথাপি গদ্যের কাজ যে কত সার্থকভাবে পয়ারছন্দের দ্বারা সাধিত হত, কৃষ্ণদাসের গ্রন্থখানি তার প্রমাণ। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভক্তিনম্রতা, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমাকূতি ও মননের সঙ্গ হৃদয়ানুভূতি এ গ্রন্থে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে।

চৈতন্যচরিতামৃত কেবলমাত্র তত্ত্বকথার নীরস আলোচনা বা সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে পূর্ণ নয়, এর মধ্যে চৈতন্যলীলার এমন সকল ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে যা সহজ মানবিক অনুভূতির স্পর্শে মেদুর। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও মাতা এবং পত্নীর প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সদাজাগর ছিলেন। তত্ত্ব ও দর্শনের মেঘাবরণের ফাঁকে মানুষ চৈতন্যের এই বিদ্যুৎ-ঝলকিত প্রকাশ কৃষ্ণদাস সহজ আন্তরিকতায় তুলে ধরেছেন।

এই গ্রন্থ বহুগুণের আকর যেমন, তেমন এতে ক্রটিও আছে। শ্রীচৈতন্যের

জীবনী লিখতে গিয়ে সব সময়ে তথ্যের ঐতিহাসিকতা মেনে চলেননি। ঘটনার রদবদল করা হয়েছে, এমনকি কবির স্বরচিত গ্রন্থের শ্লোকও (কৃষ্ণদাস সংস্কৃতে 'গোবিন্দলীলামৃত' নামে একটি মহাকাব্য চৈতন্য-তিরোধানের পর রচনা করেন) শ্রীচৈতন্যের মুখে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু-সম্পর্কে কোন তথ্য জানাননি। আর একটি ত্রুটি, অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ। বৌদ্ধসন্ন্যাসীর মুণ্ড কেটে যাওয়া ও শ্রীচৈতন্যের কৃপায় কাটা মুণ্ড জোড়া লেগে পুনরায় বেঁচে ওঠা, শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে বাঘের হরিনাম উচ্চারণ করা প্রভৃতি ঘটনা যুক্তিনিষ্ঠ পাঠকের কাছে মহাপুরুষদের অলৌকিক কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস সত্ত্বেও অবিশ্বাস্য ঠেকে।

অবশ্য এরকম দু-চারটি ত্রুটি-বিচ্যুতিতে এ জাতীয় মহাগ্রন্থের মূল্যহানি হয় না। চাঁদের কলঙ্কের মত এ অতি সামান্য ব্যাপার মনে করা যেতে পারে।

গ্রন্থ-শেষে কবি আপনার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা এই মহৎ কাব্য ও মহৎ কবিরই উপযোগী। কবি কৃষ্ণদাস বলেছেন—

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥

কবির শ্রদ্ধাবিনম্র-হৃদয়ের রূপটি কি সহজ সৌন্দর্যেই না এখানে আভাসিত হয়ে উঠেছে।

জনশ্রুতি আছে, বাংলাদেশে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠানোর কালে তা পথিমধ্যে অপহৃত হবার সংবাদে কৃষ্ণদাস আত্মহত্যা করেন। সে কাহিনী যদি যথার্থ হয় যে, এরূপ অপূর্ব গ্রন্থ বীরহাম্বীরের দস্যুদল লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল—তাহলে এরূপ একটি গ্রন্থ হারিয়ে কবির আত্মহত্যা অসম্ভব নয়। যাইহোক, ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ নষ্ট হয়নি। আর কবিও তাই মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে আছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত প্রকৃতই মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের মহান গ্রন্থ। ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে এর চেয়ে প্রিয় গ্রন্থ আর কিছু নেই। এটি তাঁদের কাছে বেদতুল্য। ভাগবত, গীতা থেকে শুরু করে সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সিদ্ধান্তের সার সঙ্কলন করে যে কৃষ্ণলীলান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণদাস রচনা করেছেন, তাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মভাব যেন পূর্ণতা পেয়েছে। পাণ্ডিত্য, ভক্তিনম্রতা ও রসজ্ঞতার দর্শন, ইতিহাস ও কবিতার এরূপ ত্রিবেণীসঙ্গম অন্য কোন বাংলা গ্রন্থে দুর্লভ। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এর সংস্কৃতে একটি টীকা লেখেন। অবাঙালী বৈষ্ণবেরা এই গ্রন্থ নাগরী অক্ষরে নকল করে নিয়ে পড়তেন—এ দুটি দৃষ্টান্ত তাঁর গ্রন্থের বহু দুর্লভ মানের পরিচয় দেয়। পরিশেষে বলতে পারি চৈতন্যচরিতামৃত নিঃসন্দেহে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

বৈষ্ণব পদাবলী

বাংলাদেশের মধ্য যুগের উষালগ্নকে আলোকিত করে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের মধুময় অভ্যুদয়। বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্য বাঙালীর কাব্যসাধনার শ্রেষ্ঠ কৃতি; বাঙালী জীবনের শুদ্ধতম বাণীময় প্রকাশ। বাঙালীর সমস্ত মধুর ও কোমল অনুভূতি, তার রূপমুগ্ধতা ও ভাবতন্ময়তা, তার জীবনদর্শনের ভক্তিসজল কমনীয়তা, তার ভালবাসার আগ্রহ এই সাহিত্যের পরিধিতে এক অপরূপ সুষমা লাভ করেছে। বাঙালী হৃদয়ের ভাবুকতা, সৌন্দর্যবোধ ও সুকোমল মাধুর্য নিঃশেষে প্রকাশিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। ভাবে-ভাষায়, ছন্দে-সুরে, রূপে-রসে সমৃদ্ধ এমন মধুর গীতিসম্ভার পৃথিবীর আর কোন ভাষার সাহিত্যে দুর্লভ। এর বিচিত্র বিষয়বস্তু, রচনারীতি, অতীন্দ্রিয়তা ও রোমান্টিকতা এ যুগের পাঠকের কাছেও এক পরম বিস্ময়াবহ ব্যাপার মনে হবে। মৌলিকতায় ও গভীরতায় শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। এর আবেদন সার্বজনীন ও সর্বকালীন।

বৈষ্ণব পদাবলী ভালবাসার গান, প্রেমের গান, প্রেমের কবিতা। বৃন্দাবনের দুটি কিশোর-কিশোরী রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র প্রণয়লীলাকে অবলম্বন করে যে গীতিসাহিত্য রচিত তাই বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর কবিগণকেও 'মহাজন' বলে। মহাজন রচিত বলে এর আরেকটি নাম মহাজন-পদাবলী।

বৈষ্ণব পদালীর বিষয় সর্বদা কৃষ্ণলীলাময় নয়। শ্রীচৈতন্যও কৃষ্ণের অবতাররূপে পদাবলীতে বহুধা গীত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাবতন্ময় দিব্য জীবনকে দেখে ও স্মরণ করে অজস্র-ভক্ত কবি পদ-রচনা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি 'গৌরপদাবলী' বা 'চৈতন্যপদাবলী' নামে পরিচিত। এর দুটি ভাগ—(১) গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ও (২) গৌরচন্দ্রিকা।

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সাধারন পদে এবং গৌরচন্দ্রিকায় পার্থক্য আছে। গৌরচন্দ্রিকা পদ মাত্রেই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক কিন্তু গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদমাত্রেই গৌরচন্দ্রিকা নয়। রাধাভাবের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিল রেখে চৈতন্যজীবনে রাধার ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি দেখিয়ে যে পদ রচিত হয়, তাই-ই গৌরচন্দ্রিকা। কিন্তু গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গৌরাঙ্গের জীবনের কথা ছাড়াও গৌরাঙ্গের নানা পরিকর, অনুচর ও নবদ্বীপবাসীর প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলী নামটি আধুনিক কালে দেওয়া। জয়দেবের গীতগোবিন্দের 'মধুর কোমলকান্ত-পদাবলী' শব্দগুচ্ছ থেকে পদাবলী শব্দটি আহৃত। দুই ছত্রের গানকে 'পদ' বলা হত। অনেকগুলি পদ-গানের আবলী বা সমষ্টি বলেই মনে হয় এই

পদাবলী নাম। বৈষ্ণব পদাবলী আধুনিক অর্থে লিরিক বা গীতিকবিতা নয়। কারণ, যে কবিতায় কবির একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা, আনন্দ-বেদনা তাঁর প্রাণের গভীর থেকে আবেগস্তনিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাই গীতিকবিতা। পদাবলী বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতির সাক্ষাৎ প্রকাশ নয়। সেগুলি রাধা অথবা কৃষ্ণের হৃদয়ভাবের প্রকাশ।

বৈষ্ণব পদাবলী শুধু পড়া হত না, গানই ছিল তার প্রধান বাহন। বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীর সার্থকতা কীর্তনগানে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী পূর্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ প্রভৃতি পালার আকারে সাজিয়ে গাওয়া হত। তাই এর পালাকীর্তন নাম। একই পর্যায়ের বিভিন্ন কবির সাজানো রচনাকে পালা বলা হত। খেতুরীর মহোৎসবে নরোত্তম দাস এই পালাকীর্তন নতুনভাবে ঢেলে সাজান। পরে পালাকীর্তনের গড়ের হাটি, মনোহরশাহী, রেনিটি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিভাগ গড়ে ওঠে।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা প্রধানত দুটি—একটি, খাঁটি বাংলা ; দ্বিতীয়টি ব্রজবুলি। 'ব্রজবুলি' নামটি আধুনিক কালে দেওয়া। ব্রজবুলি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ মৈথিলী ভাষায় লেখেন। ভাব ও ভাষায় বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুকরণের চেষ্টা করেন বাঙালী কবিরা। এর ফলে মৈথিলী বাংলায় মেশামেশি হয়ে নতুন-ভাষা ব্রজবুলি গড়ে উঠেছে, অনুমান।

পদাবলীসাহিত্যের পদকর্তাদের সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) প্রাক্‌চৈতন্য কবিবৃন্দ, (২) চৈতন্যসমকালীন কবিবৃন্দ ও (৩) চৈতন্যোত্তর কবিবৃন্দ।

প্রাক্‌চৈতন্য কবিদের শীর্ষে জয়দেবের স্থান। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যটি রচনা করলেও এর ভাব একান্তই বাংলার। তাঁর রচিত কাব্যের বুকেই প্রথম বেজে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলীর আগমনী-গান। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের অপর দুই বিখ্যাত পদকর্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

চৈতন্যদেবের সমকালে তাঁর ভক্তদের মধ্যে অনেকে পদরচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্য-তিরোভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য বহু পদকর্তার আবির্ভাব ঘটে। এঁরা সবাই মিলে বৈষ্ণব পদাবলীর ঐশ্বর্য যুগের সূচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে। তাই এ যুগ 'স্বর্ণময় যুগ' হিসেবে চিহ্নিত। বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস—এঁরা ষোড়শ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত পদকার।

বলরাম দাস

কবিকথা॥ বলরাম দাস বৈষ্ণব পদসাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। একাধিক

বলরাম দাসের সন্ধান পাওয়া গেলেও মোটামুটি দুজন প্রধান ছিলেন। একজন খুব-সম্ভব চৈতন্য-সমসাময়িক এবং নিত্যানন্দ-অনুচর ছিলেন। অপরজন গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশধর এবং চৈতন্য-পরবর্তী ছিলেন। আমাদের আলোচিত বলরাম দাস ষোড়শ শতাব্দীর কবি ছিলেন। অনুমান, কৃষ্ণনগরের দেগাছিয়া গ্রামে এঁর নিবাস ছিল এবং ইনি ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন।

কাব্যকথা॥ বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই বলরাম দাসের পদ পাওয়া যায়। তবে বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলি সমধিক কবিত্বপূর্ণ। ইনি কিছু গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ও নিত্যানন্দ-বিষয়ক পদ লিখেছিলেন। এঁর নৃত্যগীতরত গৌরাঙ্গের বর্ণনাটি সজীব ও সুন্দর—

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল॥
বিশাল হৃদয়ে গজমুক্তার হার।
পদতলে তাল ওঠে নূপুর ঝঙ্কার॥

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিলে মা শচীর স্নেহার্দ্র ব্যাকুলতা বলরামের বর্ণনাগুণে একান্ত আন্তরিক ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে—

হেদেরে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই।
অভাগিনী শচী মায়ের আর কেহ নাই॥
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে।
স্নেহভরে চুম্ব দেয় বদনকমলে॥

—বৃদ্ধা জননীর এই সকরুণ আর্তি আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের মধ্যে বাৎসল্যরসের পদরচনায় বলরাম দাসের কবিকৃতিত্ব সমধিক। এবিষয়ে তিনি দ্বিতীয়রহিত। কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনায় তাঁর কবিত্ব যেন নির্ঝরিণী ধারার মত স্বতোৎসারিত। কৃষ্ণের রক্তমাংসের মানবসন্তান রূপটি এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। শিশু কৃষ্ণের ক্ষুধাকাতরতা, ননীভক্ষণ, মাতা কর্তৃক ভর্ৎসনা ও বন্ধন, কৃষ্ণের তজ্জনিত ক্রন্দন, মান-অভিমান আমাদের ঘরের শিশুর ছবিই মনে করিয়ে দেয়। মায়ের প্রতি অভিমানে অধরস্ফুরিত করে যখন কৃষ্ণ বলে—

না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননীচোরা।

—তখন কৃষ্ণের ভগবৎ-মাহাত্ম্যের কথা সম্পূর্ণই বিস্মৃত হতে হয়।

কৃষ্ণের প্রতি যশোদার চিরবৎসল মাতৃমূর্তির প্রকাশ অনবদ্য। কৃষ্ণ গোপসন্তান, গোধন-পালন তার বৃত্তি। সুতরাং একদিন গোচারণে তাকে যেতেই হয়। শিশু

কৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রায় যশোদার মাতৃহৃদয়ের শঙ্কা ও উদ্বেগ, ব্যাকুলতা ও বেদনা গভীরতর হয়ে ওঠে। যখন বলাই ও সখাদের সঙ্গে কানাই গোষ্ঠে যায়, তখন অশ্রুছলছল হয়ে ওঠে যশোদার দুটি উৎকণ্ঠিতনয়ন। শঙ্কাতুরা মাতা করুণ কাতরতায় বলেন—

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন ॥

সন্তানকে ঘিরে মাতৃহৃদয়ের এই শঙ্কাতুরতা মানবিক মর্ত্যরসে স্নিগ্ধমধুর চারুতা পেয়েছে এখানে।

শুধু বাৎসল্য নয়, রূপানুরাগ ও রসোদ্গারের পদেও তাঁর কৃতিত্ব অনুপম। বৈষ্ণব সাহিত্যে রসোদ্গারের বহু পদে আদিরসের ফেনিলতা লক্ষণীয় কিন্তু বলরাম দাসের এই পর্যায়ের পদগুলিতে সম্ভোগের উত্তাপ অপেক্ষা রাধার প্রতি কৃষ্ণের মেদুর মমতা অপরূপ কারুণ্যে ফুটে উঠেছে। প্রিয়ের রতি নয়, আরতিই রাধার স্মৃতিতে আর এই স্মৃতির সুরভিবাসে সুবাসিত হৃদয় মেলে ধরে রাধা বলে—

মরোঁ মরোঁ সই বঁধুর বালাই লইয়া
না জানি কেমনে আছয়ে এখনে
মোরে কাছে না দেখিয়া।

বলরাম দাসের কবিকল্পনা গভীর নয়। ভাষাছন্দ অলঙ্কারের সুমিত বিন্যাস-কৌশল তাঁর জানা নেই। তথাপি তাঁর রচিত পদগুলি ভক্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতার স্পর্শে সুন্দর সৃষ্টি। অনুভূতির গভীরতায়, প্রকাশের সরলতায় ও অকৃত্রিম আন্তরিকতায় বলরাম দাস চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসেরই সমগোত্রীয়।

জ্ঞানদাস

কবিকথা ॥ জ্ঞানদাস সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কবি-চতুষ্টয়ের অন্যতম। তাঁর ব্যক্তিপরিচয় স্বল্পই পরিজ্ঞাত। চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দশাখায় তাঁর নাম মেলে। নিত্যানন্দ-বর্ণনায় যে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে ধারণা যে, তিনি নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। খেতরীর মহোৎসবে তিনি জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন,

জানা যায়। খুবসম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি আবির্ভূত হন। বর্ধমান জেলার কাঁদড়া তাঁর নিবাসভূমি ছিল। কবি আজীবন অকৃতদার ছিলেন, জানা যায়। জ্ঞানদাস অতীব সুকণ্ঠ, সুগায়ক ছিলেন। পরবর্তীকালের এক বিশিষ্ট কবি তাঁর মহিমাকীর্তন করে বলেছেন—

কবিকুলে যেন রবি চণ্ডীদাস তুল্য কবি
জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।

কাব্যকথা ॥ গোবিন্দদাস যেমন বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য হিসেবে প্রথিত, জ্ঞানদাস তেমনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য হিসেবে চিহ্নিত। চণ্ডীদাসের পদের অনুরূপ সরলতা ও নিবিড়তা তাঁর পদেও পরিদৃষ্ট হয়। তাই তাঁকে চণ্ডীদাসের 'ভাবশিষ্য' বলা হয়। কবিধর্মের দিক থেকে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের এই ঐক্য হেতু কিছু কিছু পদ উভয়ের নামে প্রচলিত রয়েছে।

বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই জ্ঞানদাসের পদ মেলে। ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি কাব্যোৎকর্ষে ম্লান, নিষ্প্রভ ; বিদ্যাপতির প্রভাব থাকায় মৌলিকতাহীন। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলিতে জ্ঞানদাসের কবিমহিমা অগ্নিশিখায় দীপ্যমান। প্রেমের দুরবগাহ রহস্য, প্রণয়ের চিরন্তন অতৃপ্তি, মিলনের আর্তি, বিরহের অগ্নিদাহ, পুনর্মিলনের প্রশান্তি তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলিতে আবেগস্পন্দিত বাণীরূপ পেয়েছে। তীব্র আবেগের উল্লাস, রূপকে অবলম্বন করে ভাবকে আশ্রয় ইত্যাদি সার্থক গীতিকবিতার স্বরূপধর্ম তাঁর পদে যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, আর কোন বৈষ্ণব কবির পদে তা হয়নি। তাঁর কবিপ্রকৃতি এককথায় বলা যেতে পারে গীতিকবিতাধর্মী ও রোমান্টিক।

জ্ঞানদাস স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, মিলন, মাথুর প্রভৃতি রসপর্যায়ের পদে জ্ঞানদাস যে কাব্যমাধুরী সৃষ্টি করেছেন, তা অনুপম। কৃষ্ণের রূপ-দর্শনে ও গুণশ্রবণে রাধার পূর্বরাগের সূচনা। কৃষ্ণের নয়নবিমোহন রূপমাধুরীতে মুগ্ধা রাধা বলছেন—

আলো মুঞি জানো না সই জানো না—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিল কালিয়া নগর ছলে ॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥

রাধাহৃদয়ের এই যন্ত্রণামিশ্রিত আনন্দবেদনার প্রকাশ এক বিষাদমাখা রোমান্টিক সৌন্দর্যে অনুপম হয়ে উঠেছে।

জ্ঞানদাসের স্বপ্নদর্শনবিষয়ক পূর্বরাগের একটি পদ ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। পদটি এই—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু পর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

অবিরল ধারায় শ্রাবণের বাদল নেমেছে। রাত্রি গভীর, বজ্র-পতনে চারিদিক স্পন্দিত, ধারাবর্ষণে মুখর দশদিশ—পালঙ্কে শয়ানা রাধা। দিনরাতের অন্তরের কামনার ধন যে, স্বপ্নের স্বর্ণরথ চড়ে আসে সে। অপ্রমেয় উল্লাসে সেই প্রিয়আগমনী-বারতা রাধা তুলে ধরে সখীদের পাশে। রহস্যময় বর্ষার রূপালেখ্যে, অপরূপ শব্দঝঙ্কারে, আশ্চর্য ভাব-গরিমায় পদটি অনন্যসাধারণ।

রূপানুরাগে বিভোর শ্রীমতী রাধা বলছেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

'প্রতি অঙ্গ লাগি' এই যে গভীর ক্রন্দন, 'হিয়ার পরশ লাগি' হিয়ার এই যে অসীম ব্যাকুলতা, তা এক ঐশী প্রেমের সুরভি বিকীর্ণ করে দেয়।

রাধার প্রণয়ভঙ্গের বেদনাও কবি কি সহজ সরলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

সুখের লাগিয়া এ-ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

—আক্ষেপানুরাগে রাধার এ কান্না আমাদেরও হৃদয়-মন অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে। মিলনের পদে জ্ঞানদাস যেন অমৃত-সৌধ রচনা করেছেন। দেহে চন্দন-চর্চা করলে

শ্যামের অঙ্গের সঙ্গে নিজ অঙ্গের পূর্ণ মিলন সম্ভব নয়, তাই তিনি চন্দন চর্চা পর্যন্ত করেন না—

হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।

জ্ঞানদাসের রাধা নিবিড় মিলনাকাঙ্ক্ষী। তাই আশ্লেষের নিবিড় বন্ধনের মাঝেও বিষাদ-বেদনার ছায়াপাতে পরিম্লান—

কোরে রহিতে কত দূর হেন মানএ
তেঁই সদাই লয় নাম॥

জ্ঞানদাসের মিলনের পদে নিজেকে হারিয়ে ফেলার, আত্মবিস্মৃতির ও আত্মবিসর্জনের পরম ব্যাকুলতা। এজন্য তাঁর মিলনের গানগুলিও বিরহের রসে সকরুণ।

বিরহের পদে জ্ঞানদাস পরচৈতন্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি। যে রাধা কৃষ্ণের ক্ষণবিয়োগে কাতরা, সেই রাধার মাথুর-বিরহের গভীর বেদনা জ্ঞানদাস অপূর্ব ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন—

সোনার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈগেল সেহ॥
গলয়ে নয়ন লোর।
মুরছে সখীকে কোর॥
দারুণ বিরহ জ্বরে।
সো ধনী গেয়ান হরে॥

বিরহিণী রাধার মৃত্যু-ছায়া-ধূসর ছবিটি হৃদয়ের পরতে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে যায়। ভাবের অকৃত্রিমতা, রসানুভূতির তীব্রতা ও প্রকাশভঙ্গীর মধুরতায় তাঁর পদ বৈষ্ণব গীতিকবিতার চরম উৎকর্ষ প্রকাশ করে। রূপ ও রসের, ভাব ও ভাষার সার্থক মেলবন্ধনে জ্ঞানদাসের পদ চিরসুন্দর।

অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ও ভাবের গভীরতায় চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সাধর্ম্য থাকলেও মনোভঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। চণ্ডীদাস আবেগ ও বেদনাকে অবলম্বন করে যতটা গভীরে নেমেছেন, জ্ঞানদাস হয়তো ততটা নয়। চণ্ডীদাস মূলত ভাবুক ও সাধক, জ্ঞানদাস প্রধানত শিল্পী ও রূপস্রষ্টা।

গোবিন্দদাস

কবিকথা॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ চৈতন্যোত্তর কবিদের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। তিনি এঁদের মধ্যমণি। তাঁর পদাবলী পড়ে মুগ্ধ হয়ে বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে কবীন্দ্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। সেই থেকে গোবিন্দদাস 'কবিরাজ' নামে

খ্যাত। গোবিন্দদাস কুমারনগরে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে শাক্ত মাতামহের অনুসরণে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা নেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রাদিতে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে 'সঙ্গীতমাধব' নামে একটি নাটকও তিনি লেখেন। নাটকটি অবশ্য বর্তমানে পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাসের পদসংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। তবে এতে গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ আচার্য এবং গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামক কবিরও কিছু পদ মিশে আছে। খুবসম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কাব্যকথা॥ গোবিন্দদাস সংস্কৃত ও বাংলায় পদ লিখে থাকলেও ব্রজবুলিতেই বেশী পদরচনা করেছেন। বস্তুত, ব্রজবুলিতে তিনি যত পদ লিখেছেন আর কোন পদকর্তা তত লেখেননি। পদরচনার ক্ষেত্রে ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারের দিক থেকে তিনি বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন। অসমাপ্তভাবে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির কোন কোন পদ গোবিন্দদাস পূরণ করেছেন, কয়েকটি পদে বিদ্যাপতির সঙ্গে যুক্ত ভণিতাও দিয়েছেন। গোবিন্দদাস রচমাধর্মে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ; 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' তিনি—

ব্রজের মধুর লীলা যাহা শুনি দরবে শিলা
গাহিলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥

বস্তুত, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবের সূক্ষ্ম চারুত্বে ও মণ্ডনকলামাধুর্যে তিনি বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করে গেছেন। গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। চিত্র ও সঙ্গীতময়তা তাঁর কাব্যরচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর সম্পর্কে স্পষ্টই বলা চলে 'he painted with words'। সচেতন রূপদক্ষ শিল্পীর ভাবের গূঢ়তা ও গাঢ়তা, আলঙ্কারিকতা এবং চিত্র ও সঙ্গীতধর্মিতা তাঁর পদসমূহকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। গৌরাঙ্গদেবকে অবলম্বন করে রচিত পদগুলিতে তাঁর এই বিশিষ্টতার নিদর্শন মেলে। চিত্র ও গীতরসে এগুলি তিনি অপরূপ ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। চৈতন্যদেবের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব।
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
স্থরধুনী তীরে উজোর ॥

চৈতন্যদেবের করুণাঘন ও দিব্যজীবনচিত্র রঙে-রসে নিবিড় উজ্জ্বলতা পেয়েছে এখানে।

গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যকে প্রত্যক্ষ দেখেননি, অথচ মানসদৃষ্টিতে তাঁর যে ভাবমূর্তি এঁকেছেন, তা অতুলনীয়। গৌরচন্দ্রিকা রচনায় অন্যেরা তো দূরের কথা, শ্রীচৈতন্যকে প্রত্যক্ষদর্শন করে যাঁরা পদরচনা করেছেন, সেই প্রত্যক্ষদর্শী কবিরাও তাঁর কবিত্বের কাছে তুচ্ছ গণ্য হবেন। তাঁর গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ কল্পনার ঐশ্বর্যে, ভাবের গাঢ়বন্ধতায় ও সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যে, ছন্দোলালিত্য ও অলঙ্কারের কারুকার্যে অসাধারণ কবিকর্ম।

রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলামাধুরী নিয়ে লেখা পদগুলিতেও তাঁর অনন্য কবিকৃতির স্বাক্ষর বর্তমান। রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিমান, মান, মিলন, বিরহ, রাস ইত্যাদি বহু বিষয়ে গোবিন্দদাস অজস্র পদ লিখেছেন। তিনি সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রূপানুরাগ, মিলন আর অভিসারের পদে।

রূপানুরাগের পদে গোবিন্দদাসের যে শিল্পচাতুর্য এবং অনুভূতির প্রগাঢ়তার স্বাক্ষর মেলে তা বিরলদৃষ্ট। এতে গোবিন্দদাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তিনি রূপকে নিরীক্ষণ করেছেন, অনুভব করেছেন, কল্পনার জারক-রসে জারিত করেছেন, তারপর তা বাণী-বন্ধনে মূর্ত করেছেন। রাধার হৃদয়ে প্রেমবিহ্বলতা ও রাগময়তা অপরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন গোবিন্দদাস এই পদে। রাধা কৃষ্ণকে দেখে বিস্ময়ে বলে ওঠেন—

নীল রতন কিয়ে নবঘন ঘটা।
লখিল লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা ॥···
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন-মহেন্দ্রধনু কিবা দিল দেখা ॥

এই পদে রূপস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে লিপিচাতুর্য, ছন্দোবৈচিত্র্য, শব্দৈশ্বর্য ও ধ্বনিঝঙ্কার সাফল্যের উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছে।

একটি পদে রাধারূপ-বিভোর কৃষ্ণ রাধার অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যুতের জ্যোতি আর প্রতি পদক্ষেপে প্রফুল্ল পদ্মের বিকাশ দেখেন—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমল-দল খলই ॥

কবির বর্ণনাকৌশলে সৌন্দর্যের ভাবপ্রতিমারূপে রাধা উদ্ভাসিতা এখানে। এক অপার্থিব লাবণ্য-মায়ায় কৃষ্ণ যেন আবিষ্ট, অভিভূত। শব্দ-অলংকার-ভাবৈশ্বর্যদীপ্ত

রূপানুরাগের এমনি বহু পদ আছে গোবিন্দদাসের পদমঞ্জুষায়।

✓মিলনবিষয়ক পদরচনাতেও গোবিন্দদাসের বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষণীয়। কুসুমিত কুঞ্জকাননে প্রফুল্লহৃদয় রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের বিপুল উল্লাস উচ্ছ্বসিত ভাষায় আবেগময় ছত্রে সুন্দর প্রকাশ করেছেন—

নব ঘন কানন শোভিল পুঞ্জ।
বিকশিত কুসুমে সুশোভিত কুঞ্জ ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল।
তহি বলি অপরূপ রতন হিণ্ডোর।
তহি পর বৈঠল কিশোরী কিশোর ॥

✓অভিসারের পদরচনায় গোবিন্দদাস কবিসম্রাট। রাধার অভিসারযাত্রার প্রতিটি পদ অপূর্ব ও অনবদ্য॥ দিবাভিসার, হিমাভিসার, বর্ষাভিসার—বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে বিভিন্ন অভিসার ও অবস্থার বর্ণনায় 'নিতুই নৌতুন' বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কৃষ্ণের মোহন বাঁশী বেজেছে রাধা রাধা সুরে। রাধার হৃদয় উচাটন, প্রিয়তমের সঙ্গে তাকে মিলতেই হবে। কুলবালা নিশীথরাত্রে নিজেকে অভিসারযাত্রার উপযোগী করে তুলতে শুরু করে দুরূহ সাধনা—

কণ্টক গাড়ি কমল-সম-পদতলে
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥···
দূতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।

অভিসারের বিঘ্নসঙ্কুল পথে পদচারণার জন্য যে তুলনাহীন কৃচ্ছ্রসাধনার বেদনা এ-পদের অন্তরাল হতে ধ্বনিত হচ্ছে তা সম্পূর্ণ হৃদয়সংবেদ্য। বেদনায় সমুজ্জ্বল, দুঃখে মহীয়সী রাধার এই তপস্যা মহাযোগিনীর তপস্যা—পঞ্চতপা পার্বতীর সাধনার চেয়েও এ সাধনা কঠিন। বর্ষার আঁধার রাতে, কর্দমপিচ্ছিল পথে দুরূহ অভিসারযাত্রায় রাধা প্রস্তুত। আকাশ কৃষ্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন, ঝঞ্ঝামুখর; খরশাণ বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ধারায় রাত্রির আঁধার মুহুর্মুহু দীর্ণ; 'ঘন ঘন ঝনঝন বজর নিপাত', অবিশ্রান্ত বারিধারা, চারিদিকে ঘন অন্ধকার, বিশ্বচরাচর জুড়ে দুর্যোগের ভয়ঙ্করতা—কোন কিছুরই ভ্রূক্ষেপ না করে প্রেমসাধিকা রাধা পা বাড়াতে উদ্যত হয়েছেন। সখী ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছে—

ঘন ঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরি জাত॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥

রাধা প্রত্যুত্তরে বলছেন—

যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।

যাঁর চরণতলে রাধা নিজ জীবন সমর্পণ করে দিয়েছেন, তাঁর জন্য অভিসারে কি তুচ্ছ দেহের ভাবনা মনে আসে। যে প্রেম অন্তরে অনন্তের স্পর্শ এনে দেয়, যে প্রেমকে বোঝানো যায় না, যা শুধু বেদনার মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে পরম অনুভবের সাহায্যে উপলব্ধি করতে হয়, গোবিন্দদাস সেই প্রেমেরই বন্দনাগান গেয়েছেন। তাই গোবিন্দদাসের রাধার অভিসারে লেগেছে লোকাতীতের স্পর্শ, বিচ্ছুরিত হয়েছে তাতে অমর্ত্যপ্রেমের দিব্য আভা। অলঙ্কার সজ্জায়, শব্দচিত্রে, ধ্বনিসুষমায় তাঁর অভিসারের পদগুলি নিটোল সুডৌল শিল্পকর্ম।

অভিসারের পদে গোবিন্দদাস যে অসীম শক্তির বিকাশ দেখিয়েছেন, বিরহের পদে কবির সেই শক্তির অভাব। তবুও দু-একটি পদে বেদনার বাঙ্ময় রূপের রসঘন প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। একটি পদে বর্ষার রাত্রিতে বিরহিণী রাধার মর্মবেদনা অপূর্ব প্রকাশিত—

নৈরাশ বাসর রজনি দশদিশ
গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনি পলকে কামিনী
হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপ ডাহুকি ডাহুকে ডাকই
মউর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিদলোচনে
জাগি সগরিহ রাতিয়া॥

নির্জন নিঃসঙ্গ রাত্রি, ঝড়ঝঞ্ঝামুখর আকাশ এবং বিনিদ্র লোচনে রাধার একাকিনী জেগে থাকার চিত্রটি পাঠকহৃদয়ে চিরমুদ্রিত হয়ে যায়। বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাস কতকগুলি প্রার্থনার পদও লেখেন। এগুলিতে তাঁর প্রাণস্পর্শী বৈষ্ণবীয় দীনতা ও কঠোর আত্মজিজ্ঞাসারই স্বাক্ষর মেলে। উপমা-উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কার-প্রযুক্তিতে, বাগ্‌বিন্যাসের গাঢ়তায়, ভাববৈচিত্র্যে এবং অপরূপ পদলালিত্যে ও ছন্দের হিন্দোলে

গোবিন্দদাসের পদ নিখুঁত শিল্পকৃতি। তাঁর কিছু কিছু পদের রূপনির্মাণ ও ছন্দোঝঙ্কার একালের পাঠকেরও বিস্ময়মুগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। গোবিন্দদাস শুধুমাত্র কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুগপৎ কবি ও সাধক। বৈষ্ণব ধর্মসাধনা ও রসসাধনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় হয়েছিল। ভক্তি ও কবিত্ব এ দুয়ের আধারে রচিত হওয়ায় তাঁর পদ হয়েছে মনোজ্ঞ ও চিত্তস্পর্শী। শব্দঝঙ্কার, ছন্দ, অলঙ্কার সব কিছু মিলিয়ে তাঁর পদ কাব্যশ্রীমণ্ডিত। তিনি সৌন্দর্যরসিক রূপদক্ষ কবি। কবি তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কে বলেছেন—

রসিকরোচন শ্রবণবিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

স্বাভাবিক কবিশক্তি ও নিখুঁত কারুকৃতির সমাবেশ হওয়ায় তাঁর পদ প্রকৃতই 'রুচির' ও 'রসিকরোচন'।

ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যে কাব্য রচিত হয়েছে, তাই ধর্মমঙ্গলকাব্য। ধর্মঠাকুরের পূজা বেশ প্রাচীন হলেও তাঁকে নিয়ে কাব্য লেখা অনেক পরে শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, চণ্ডী বা মনসার মত ধর্মঠাকুর স্ত্রী-দেবতা নন, তিনি পুরুষ-দেবতা। পশ্চিমবঙ্গেই এই দেবতার পূজার প্রচলন দেখা যায়। সাধারণতঃ ডোম-সমাজেই এই দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল, এখনও আছে।

ধর্মঠাকুর নিরঞ্জন নিরাকার আদ্যদেবতা। ধর্মঠাকুরের উদ্ভবের মূলে কেউ বৌদ্ধ-ধর্মের ত্রিরত্নের, কেউ বা বৈদিক সূর্যদেবতার, কেউ বা আর্যেতর প্রভাব অনুসন্ধান করেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, কূর্মবাচক অস্ট্রিক শব্দ 'দড়ম' থেকে ধর্মের উৎপত্তি। তা যদি হয়, এ ঠাকুরের আর্যেতর উৎস স্বীকার করতেই হয়। পূজাপদ্ধতি, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পূজাপ্রচলন প্রভৃতি থেকে ইনি গোড়াতে আর্যেতর দেবতা ছিলেন, মনে হয়। অবশ্য ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্মঠাকুরের যে বর্ণনা আছে, তাতে কিন্তু হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিরই প্রভাব বেশী পড়েছে, দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য, মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সব সংস্কার মিলে ধর্মঠাকুর এমন এক বিমিশ্র আকার পেয়েছে, যা থেকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ধর্মঠাকুরকে নিয়ে দু-শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায়। একশ্রেণীর রচনা, ধর্মঠাকুরের উদ্ভব ও ধর্মপূজার বিধানসম্পর্কিত। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' এ জাতীয় রচনা। অপর শ্রেণীর রচনা, ধর্মদেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্য। এতে মোট দুটি কাহিনী দেখা যায়—(১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প এবং (২) লাউসেনের গল্প। তবে লাউসেনের কাহিনী অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। বলতে গেলে এই কাহিনীই যথার্থ ধর্মমঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। আমরা এখানে লাউসেনের কাহিনীটিই সংক্ষেপে বলছি—

কাহিনী॥ ধর্মঠাকুর মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য আগ্রহী। স্বর্গে দেবতাদের সভায় নর্তকী জাম্ববতীর তালভঙ্গ হওয়ায় তাকে মর্ত্যে মানুষের গৃহে জন্মানোর শাপ দেওয়া হয়। জাম্ববতী রমতিনগরে বেণু রায়ের কন্যা হয়ে জন্মাল, নাম হল রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর এক বোন গৌড়ের রাজার পাটরাণী আর বড় ভাই মহামদ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী।

ঢেকুরগড়ের অধিপতি কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের অধীন সামন্ত-রাজা। তাঁর ছয় ছেলে বিদ্রোহী ইছাই ঘোষকে দমন করতে গিয়ে যুদ্ধে মারা যায়। পুত্রহীন বৃদ্ধ কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের অনুরোধে তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিয়ে করেন এবং রাজার অনুগ্রহে ময়নাগড়ের অধিপতি হন।

রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ মহামদের প্রীতিজনক হল না। গৌড়েশ্বরকে

কিছু বলবার তার সাহস হল না, তাই সে শত্রুতা আরম্ভ করল কর্ণসেনের সঙ্গে। 'শালে ভর' দিয়ে ধর্মের অনুগ্রহে রঞ্জাবতী লাউসেন নামক পুত্রলাভ করলে মহামদ শিশুকে হত্যার জন্য উদ্যত হল। মহামদের আদেশে ইন্দা মেটে নামে তাঁর এক অনুচর শিশু লাউসেনকে অপহরণ করল। পুত্রকে হারিয়ে রঞ্জাবতী উন্মাদিনীপ্রায় হয়ে উঠল! রঞ্জাবতীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ধর্মঠাকুর কর্পূরবিন্দু থেকে এক শিশুর সৃষ্টি করে রঞ্জাবতীর কোলে তুলে দিলেন। শিশুটির নাম হল কর্পূরধবল। এদিকে ধর্মঠাকুরের অনুচর হনুমান অপহৃত লাউসেনকে উদ্ধার করে আনল। এখন রঞ্জাবতীর দুই ছেলে—লাউসেন আর কর্পূরধবল।

লাউসেন ক্রমে বড় হয়ে উঠল এবং যুদ্ধবিদ্যা ও লেখাপড়ায় বিশেষ পণ্ডিত হয়ে উঠল। গৌড়েশ্বরের কাছে বীরত্ব দেখাবার জন্য লাউসেন একদিন কর্পূরধবল সহ গৌড়যাত্রা করল। পথে অনেক বাধাবিঘ্ন ডিঙ্গিয়ে ও অসতী নারীর প্রলোভন জয় করে পৌছল গৌড়ে। কিন্তু গৌড়ে পৌছেই মাতুল মহামদের চক্রান্তে হল কারারুদ্ধ। তারপর বাহুবল দেখিয়ে রাজাকে তুষ্ট করে কারামুক্ত হল। শুধু তাই নয়, ময়নাগড়ের তালুকও ইজারা পেল। স্বদেশে ফেরার পথে কালু ডোম ও তার পত্নী লখ্যার সঙ্গে হল বন্ধুত্ব। লাউসেন এদের নিয়ে ফিরল ময়নাগড়ে। কালু ডোম হল তার প্রধান সেনাপতি।

এদিকে মহামদ আবার লাউসেনের অনিষ্ট করার ফন্দিফিকির খুঁজতে লাগল। মহামদের পরামর্শে গৌড়রাজ লাউসেনকে কামরূপের রাজাকে দমন করতে পাঠালেন। কামরূপরাজাকে হারিয়ে তাঁর কন্যা কলিঙ্গাকে বিয়ে করে দেশে ফিরল লাউসেন। চক্রান্তটি ব্যর্থ হওয়ায় মহামদ হিংসায় জ্বলতে লাগল। ভাগিনেয়ের মৃত্যু তার কাম্য—তাই অচিরে আবার এক ফন্দি আটল। মহামদের প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হল। রাজা সিমুলরাজ্য অভিযান করলেন, সঙ্গে নিলেন লাউসেনকে। হরিপালের কন্যা ঘোষণা করল, যে বীর তার লৌহনির্মিত গণ্ডারকে এক কোপে ছিন্ন করতে পারবে তাকেই সে স্বামীত্বে বরণ করবে। গৌড়েশ্বর গণ্ডারটি এক কোপে কাটতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন কিন্তু বীর লাউসেন তা করতে সক্ষম হল। কানড়া লাউসেনকেই বিয়ে করল। কানড়া ও তার সাহসী দাসী ধুমসীকে নিয়ে লাউসেন ফিরে এল দেশে। এরপর ইছাই ঘোষকে দমন করতে লাউসেনকে আদেশ দেওয়া হল। অজয় নদীর তীরে উভয়পক্ষে হল তুমুল যুদ্ধ। ধর্মঠাকুরের সাহায্যে লাউসেন বিজয়ী হল। ইছাই ঘোষ হল পরাস্ত ও নিহত।

এত কিছু চক্রান্ত সত্ত্বেও লাউসেনের অনিষ্ট করতে না পেরে মহামদ লাউসেনকে

একটি ভীষণ বিপদে ফেলল। গৌড়েশ্বরকে দিয়ে আদেশ করল, পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দেখাতে হবে লাউসেনকে, না পারলে শাস্তি মৃত্যু। পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তবু 'হাকন্দ' নামক স্থানে ধর্মঠাকুরের তপস্যা করে লাউসেন এই অসম্ভবকে করল সম্ভব।

এদিকে লাউসেন যখন ধর্মঠাকুরের তপস্যা করছিল, তখন সেই সুযোগে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করল। দ্বাররক্ষী কালুডোম উৎকোচ নিয়ে প্রথমে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেনি কিন্তু লখ্যার ভর্ৎসনায় অবশেষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হল। এই যুদ্ধে পুত্র এবং পত্নীসহ কালু এবং লাউসেনের প্রথমা স্ত্রী কলিঙ্গা মারা গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাউসেনের দ্বিতীয়া স্ত্রী কানড়া ও তার দাসী ধুমসার কাছে হেরে গিয়ে পালাতে বাধ্য হল মহামদ। লাউসেন দেশে ফিরে এসে দেখল ময়নাগড় বিধ্বস্ত, অনুচর ও প্রিয়জনেরা নিহত। শেষে ধর্মঠাকুরের স্তব করে সবাইকে বাঁচিয়ে তুলল। মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারিত হল। তারপর পুত্র চিত্রসেনকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বর্গারোহণ করল লাউসেন। কাহিনী এখানেই সমাপ্ত।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের পটভূমিতে রাঢ়দেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এককালে রাঢ়ভূমি বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার ছিল। এই ভূভাগের মানুষকে পাঠান, মোগল, বর্গী ইত্যাদি বহিরাগত জাতির আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তারা বীরত্ব ও সাহসের সুদীপ্ত পরিচয় রেখেছে। লাউসেন ও তার ডোম-অনুচরদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপে এই শৌর্যবীর্যের স্বাক্ষর বিধৃত। এসব কারণে ধর্মমঙ্গলকে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলা হয়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যেটুকু পুরুষবীর্য তা কেবল ধর্মমঙ্গলেই চোখে পড়ে। নারীদের বীর্যবত্তাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কবিবৃন্দ

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষ কোন সন্ধান মেলে না। পশ্চিমবঙ্গের অনেক কবি ধর্মমঙ্গল লিখেছেন। এঁদের মধ্যে মাণিকরাম গাঙ্গুলি, রূপরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ময়ূরভট্ট

ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি-কবি, অনুমান। সব ধর্মমঙ্গলকাব্যে তাঁকে আদি-কবি বলা হয়েছে। তাঁর রচনা 'হাকন্দপুরাণ' নামে খ্যাত। কবির ব্যক্তিপরিচয় কিছু জানা যায়নি। খুবসম্ভব, তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

রূপরাম চক্রবর্তী

কবিকথা॥ রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। কবি বর্ধমান জেলার

বাইতি শ্রীরামপুরবাসী ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর কাব্যের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁর কাব্য রচিত হয়ে থাকবে। কবির লেখা আত্মজীবনীটি কবির ব্যক্তি-জীবনের প্রসঙ্গে প্রাণময়। সরল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় কবি আপন জীবনকথা ব্যক্ত করেছেন। অগ্রজ ও গুরু কর্তৃক নানা সময়ে ভর্ৎসিত হওয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা উপভোগ্য। ধর্মঠাকুরের কৃপালাভের কাহিনীটি বেশ সরস ও উপভোগ্য। একদিন পুকুর-পাড়ে একটি বাঘ দেখে কবি বিপদে পড়েন। স্বয়ং ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হয়ে বাঘের কবল থেকে কিশোর কবিকে মুক্ত করেন। তাঁর মহিমাবিষয়ক ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনার আদেশ দিলে কবি ধর্মঠাকুরের নির্দেশে কাব্যরচনা করেন। ধর্মঠাকুরের উপাসনার অপরাধে কবিকে খুবসম্ভব জাতিচ্যুত হতে হয়েছিল।

কাব্যকথা॥ রূপরামের কাব্য প্রশংসার যোগ্য। তাঁর রচনার প্রধান গুন সরলতা। তাঁর ভাষা অলঙ্কারের ভারহীন, ভাব সহজ আন্তরিকতায় ভরা। বিশেষ-করে রঞ্জাবতীর 'শালে ভর' দেবার কালে কবি তার দুর্বল ও আর্তমানবহৃদয়ের রূপটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন—

পুত্রবর নাঞী পাই শালে গিয়া মরি।
মনে পুনর্বার জীব হেন সাধ করি॥
কি কহিব কাহারে এ বচন অগাধ।
এমন বয়সে মরি বিধাতার সাধ॥

চরিত্রচিত্রণেও তাঁর কুশলতা লক্ষণীয়। লাউসেন গৌড়যাত্রা করলে পথে নয়ানী নামে এক নারী তার মন ভুলিয়ে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। নয়ানীর ছলনাভরা কথা শুনে লাউসেন কানে হাত দিয়ে বলে—

কি করিব পান গুয়া শীতলচন্দন।
গৃহস্থের বাড়ী আমি যাই না কখন॥
শিশুকাল হৈতে আমি ধর্মের তপস্বী।
শুক্রবার দিনে মোর ধর্ম-একাদশী॥—ইত্যাদি

এই নিরলঙ্কৃত বর্ণনার মধ্যে লাউসেনের চরিত্রসংযম কবি কি অপূর্বই না ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি দেবতার দিকে তাকিয়েও বাস্তব দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেননি। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যথোচিত বাণীরূপ দিয়েছেন। এখানেই রূপরামের কবিপ্রতিভার বিশিষ্টতা।

ঘনরাম চক্রবর্তী

কবিকথা॥ ধর্মমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যই

ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রথম ছাপা হয়েছে। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির বাস ছিল। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত, মায়ের নাম সীতাদেবী। ঘনরাম রামভক্ত ছিলেন। ভণিতাংশে তিনি বহু জায়গায় 'কৌশল্যানন্দন কৃপাবান'-এর উল্লেখ করেছেন। কবির চারপুত্রের নামকরণের মধ্যে রামভক্তির পরিচয় মেলে। পুত্রদের নাম এরূপ ছিল—রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামকৃষ্ণ। ঘনরাম তাঁর কাব্যে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করেছেন। খুবসম্ভব ইনি কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর ধর্মমঙ্গলকাব্যের রচনাকাল ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ।

কাব্যকথা॥ ঘনরাম তাঁর কাব্যকে 'ধর্মমঙ্গল' ভিন্ন অন্য নামেও অভিহিত করেছেন। তাঁর কাব্যের 'শ্রীধর্মসঙ্গীত', 'অনাদিমঙ্গল', 'মধুরভারতী' ইত্যাদি অভিধা মেলে। কবি তাঁর কাব্যকে কয়েকটি 'পালা'য় ভাগ করেছেন এবং পালাগুলি ক্রমানুসারে সাজিয়ে বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে কাহিনীর ইতি টেনেছেন। মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ চৌতিশা, নারীগণের পতিনিন্দা, নবজাতকের নানাবিধ সংস্কার ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। তবে পতিনিন্দার ব্যাপারটি কবি সহজ মনে নিতে পারেনি। তাঁর কথায়—

চিত্তে অধোগতি নিন্দা করে পতি
ত্যজে লোকভয় ধর্ম।

ঘনরাম সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শাস্ত্র, পুরাণ ও পৌরাণিক-কাব্যে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁর কাব্যরচনার পটভূমিকায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের প্রভাব লক্ষণীয়। লাউসেনের বাল্যলীলার কাহিনী ভাগবতের কৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুসারী। ইছাই ও লাউসেনের যুদ্ধে রামরাবণের যুদ্ধের ছায়াপাত স্পষ্ট।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে চৈতন্যদেবের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। প্রতিটি পালায় কাহিনী আরম্ভের পূর্বে তিনি যে প্রার্থনাপদগুলি লিখেছেন, তাতে ভক্তহৃদয়ের আত্মনিবেদনের বাসনা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘনরামের রুচিবোধ অতি মার্জিত। যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতাদোষ মঙ্গলকাব্যগুলিতে সচরাচর দেখা যায়, ঘনরামের কাব্যে তা পরিদৃষ্ট হবে না। তাঁর কাব্যে যে কাহিনী অশ্লীল মনে হবে, তাও পৌরাণিক মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। হাস্য ও কৌতুকরস সৃষ্টিতে ঘনরাম শোভন পরিমিতিবোধ ও সূক্ষ্মরসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। হাস্যরসে স্থূল ভাঁড়ামি ও গ্রাম্য রসিকতা নেই। যুদ্ধবর্ণনায় এবং যুদ্ধচিত্র-রচনায় তাঁর দক্ষতা তুলনাহীন। রাজা কর্পূরধবলের সঙ্গে কালু ডোমের যুদ্ধ তার প্রমাণ—

শরের নিশান শুনি সন্ সান্
ঝন্‌ঝান ঝাঁকিছে খাঁড়া।

টাঙ্গি টন্‌টন্ হানে ঠন্‌ঠন্
সেনাগণে দিয়ে তাড়া ॥

সুনির্বাচিত শব্দের প্রয়োগে যুদ্ধের ঘনঘটা কবি অপূর্ব জীবন্ত ও বাস্তব করে তুলেছেন। অলঙ্কার এবং ছন্দপ্রয়োগে তাঁর কুশলতা অনস্বীকার্য। মহৎ শিল্পীজনোচিত সংযম, সরস এবং স্বাচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গী, বাস্তবজীবনবোধ, সর্বোপরি সুনিপুণ চরিত্রচিত্রণ তাঁর কাব্যকে এক বিশিষ্ট মর্যাদায় মণ্ডিত করেছে। কবির প্রখর বাস্তববোধ, গভীর অন্তদৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁর চিত্রিত চরিত্রগুলিকে স্পষ্টরেখ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে। লাউসেন ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহপুষ্ট। তাঁকে ধর্মঠাকুর সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এই দৈবানুকূল্যের কথা বাদ দিলে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, ধর্মপথ-অবলম্বন, মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি মানবীয় গুণের সমুন্নত আধার করে লাউসেনকে চিত্রিত করেছেন। রঞ্জাবতী শাপভ্রষ্টা স্বর্গের অপ্সরা। কবি মর্ত্যের মানবীরূপে তাঁর চরিত্রটি অসামান্য কুশলতায় এঁকেছেন। এক স্নেহশীলা, পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় সতত অধীরা রঞ্জাবতীর জননীমূর্তি চিরকালের বাঙালী মায়ের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। লাউসেন যুদ্ধে যাবার জন্য যখন দৃঢপ্রতিজ্ঞ, মায়ের অনুরোধ-উপরোধে কিছুতেই নিরস্ত হতে সম্মত নয়, তখন রঞ্জাবতী লাউসেনকে বলছে—

কালি অতি শুভদিন গৌড়ে তুমি যাবে।
অভাগীর রন্ধন বাপু আজি কিছু খাবে ॥

তাঁর এই আকাজ্ক্ষায় সন্তানবৎসল বাঙালী-মাতৃহৃদয়ের অমেয় সুধাধারা ঝরে পড়েছে। কলিঙ্গ, কানাড়া প্রভৃতি নারীচরিত্রের বীর্যবত্তা পরিস্ফুটনেও তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়।

মহামদ ধর্মমঙ্গলকাব্যের শঠ চরিত্র, সে হিংসা ও কুটিলতার প্রতিমূর্তি। ঘনরাম এই চরিত্রটিকে সর্বাংশে ক্রুর করে আঁকেননি। ভগিনী ও ভাগিনেয়ের প্রতি কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার আড়ালে এক অন্তঃশায়ী স্নেহধারার পরিচয় মেলে। কামরূপ থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথমেই—'রঞ্জাবতী ভগ্নী বলি ডাকেন সোহাগে'।

কালু ডোম, লখাই প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রগুলিও তাদের স্বকীয় মহিমায় মণ্ডিত করে চিত্রিত করেছেন। পাতিব্রত্য ও স্নেহশীলতা, দুর্জয় সাহস, অবিচলিত কর্তব্যবোধ এবং অসাধারণ ধৈর্য লখাই চরিত্রটিকে অসামান্য মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর কাব্যে বীরত্ব, মনুষ্যত্ব ও নারীধর্মের সুউচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। উদার ভাবনায়, মানবিকতাবোধে ও আদর্শের মহান কল্পনায় ঘনরামের কাব্য মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য মহিমায় ভাস্বর। সর্বোপরি রাঢ়বঙ্গের সমাজ ও ইতিহাসের দিক থেকে এ গ্রন্থের মূল্য অমেয়।

কাশীরাম দাস ও তাঁর মহাভারত

কবিকথা ॥ মহাভারত-অনুবাদকদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দেব। ভগীরথ যেমন কঠোর তপস্যায় গঙ্গার পূতধারা মর্ত্যে এনে সাগর-সন্তানদের মুক্তি দিয়েছিলেন, কাশীরামও তেমনি দুরূহ সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় ভারতকথা রূপান্তরিত করে বাঙ্গালীর হৃদয়মন তৃপ্ত করেছিলেন। কায়স্থ বংশে কবির জন্ম। বিষ্ণুভক্ত কবি বিনয়বশত নিজেকে 'দাস' বলেছেন। বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গিগ্রামে কবির জন্ম। পিতার নাম কমলাকান্ত। কবির অপর দুজন ভ্রাতার নাম কৃষ্ণরাম ও গদাধর। কাশীরাম মেদিনীপুর জেলার আসিগড়ের রাজবাড়ীতে থেকে পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। রাজবাড়ীতে রামায়ণের কথকতা হত। তাই তাঁকে মহাভারত-রচনায় প্রাণিত করে থাকবে। কবি মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অনুবাদ করেছিলেন কিনা বলা শক্ত। কারো কারো মতে, আদি, সভা, বন ও বিরাট এই চারটি পর্বের মাত্র তিনি অনুবাদ করেছিলেন—

আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর ॥

কাশীরামের কোন কোন পুথিতে প্রাপ্ত উপর্যুক্ত ছত্রটি এরূপ ধারণার মূলে রয়েছে। তাছাড়া, প্রথম চারটি পর্বে রচনার যেমন সংহতি আছে, পরের পর্বগুলিতে তা নেই। নানাপ্রকার অসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খলা আছে। তাই ধারণা করা হয়, কাশীরাম মহাভারত-অনুবাদ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। পণ্ডিতদের মতে, তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র মিলে কাব্যখানি সমাপ্ত করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত কাশীরাম দাসের মহাভারত জনপ্রিয় হয়েছিল। কাব্যটি বহুল প্রচারিত হওয়ায় ভাষার যেমন পরিবর্তন ঘটেছিল, তেমনি বিষয়বস্তুতে কিছু প্রক্ষেপ দেখা দিয়েছিল। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত কাশীদাসী মহাভারতেরও পরিমার্জনা করেছিলেন। তিনি মূল রচনা আমূল বদলে দিয়েছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। তা কিন্তু যথার্থ নয়। কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় তাঁর কাব্য লিখেছিলেন।

কাব্যকথা ॥ কারো কারো ধারণা, কাশীরাম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না এবং কথকদের মুখে শুনে তিনি মহাভারত রচনা করেন কিন্তু এ ধারণা সঠিক বলে মনে হয় না। আদি, সভা, বন প্রভৃতি পর্বের বহু ছত্রে মূল সংস্কৃত শ্লোকের হুবহু অনুবাদ দেখা যায়। যেমন, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে অ-পূর্বপরিচিতা বলে প্রত্যাখ্যান করলে শকুন্তলা যে তেজোদৃপ্ত জবাব দিয়েছিলেন, তাতে মূলের সৌন্দর্য হুবহু প্রতিফলিত—

লুকাইয়া যেই জন করে পাপকর্ম।
লোকে তা না জানিলেও জানেন তা ধর্ম ॥

চন্দ্র সূর্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধর্ম জানয়ে সকল ॥—ইত্যাদি

কাশীরামের রচনা মূলানুগ হলেও তিনি দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য গুরুভার আলোচনাকে সযত্নে পরিহার করেছেন, যেমন—ভীষ্মপর্বের গীতাপর্বাধ্যায়। মধ্য যুগের সব অনুবাদকের মত কাশীরামও মূলের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। ব্যাসের বহু কাহিনী তিনি বাদ দিয়েছেন এবং অনেক নতুন কাহিনী জুড়েছেন। তাঁর মহাভারতে পারিজাতহরণ, সত্যভামার তুলাব্রত, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান প্রভৃতি যে-সব ঘটনা রয়েছে, তা মূলে নেই। কাশীরাম দাসের মহাভারতের পর্বগুলি ব্যাসের মহাভারতের মত সংখ্যায় আঠার হলেও নামে ও বিষয়ে একরকম নয়।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের মূল বৈশিষ্ট্য—এর মধ্যে পরিবেশিত প্রেমভক্তি রস। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্মের বন্যায় বাংলাদেশ তখন প্লাবিত। বংশানুক্রমে কবিও ছিলেন বৈষ্ণব। ফলে তাঁর কাব্যে প্রেমভক্তিভাবুকতার প্রাধান্য ঘটেছে। মহাভারতের উদাত্ত বীর্যগাথা কোমলস্নিগ্ধ প্রেমকথায় রূপান্তরিত হয়েছে। দুই বীরনায়ক কৃষ্ণার্জুন বাঙালীর মনোমোহন নবঘনকান্তি শ্যামের মূর্তি নিয়েছে। অর্জুনের দেহ-বর্ণনায় তার পরিচয় গূঢ়—

অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥

এ এক অসাধারণ প্রতিভার কাজ। এখানেই কাশীরাম দাসের মৌলিকতা।

কাশীরাম তাঁর রচনাকে ঘটনাবিন্যাসের নাটকীয়তায়, সরস উক্তিপ্রত্যুক্তিতে এবং হাস্যরসের পরিবেশনে লোকপ্রিয় করে তুলেছিলেন। সভাগৃহে দ্রৌপদীর পাশে হিড়িম্বা বসলে দ্রৌপদী সতীনসুলভ ঈর্ষায় হিড়িম্বাকে বললেন—

কি আহার কি বিচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তার না জানি কারণ ॥

তার জবাবে হিড়িম্বাও দ্রৌপদীকে শুনিয়ে দিলেন—

অকারণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার।
পরে নিন্দা নাহি দেখ ছিদ্র আপনার ॥

এভাবে দুসতীনে যখন চুলোচুলি হবার উপক্রম, তখন 'আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বনাইল'। এই কৌতুকরসসিক্ত উক্তিপ্রত্যুক্তি বাস্তবজীবনানুসারী বলে খুবই আকর্ষণীয়।

কাশীরামের বর্ণনা সরস, গতিযুক্ত। কিন্তু তাঁর ভাষায় সংস্কৃত শব্দপ্রয়োগ ও সমাসসন্ধির অতিরেক থাকায় তা স্বচ্ছন্দ নয়। কিন্তু তাতে মহাভারতের রসস্রোতে 'কাব্যতৃষ্ণা' নিবারণে বাঙালীর অসুবিধা ঘটেনি।

কাশীদাসী মহাভারতের চরিত্রগুলি মূলের মত শৌর্যবীর্যে দীপ্ত নয়, নম্র কমনীয়তায় মেদুর। পঞ্চপতিগর্বিতা বজ্রাগ্নিরূপিণী দ্রৌপদী তাঁর কাব্যে হয়ে উঠেছেন অবলা ও ব্যাকুলা বাঙালী বধূ। পাণ্ডবদের বনগমনের বেশ দেখে মা কুন্তীর কান্না এবং পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সান্ত্বনাদান ইত্যাদি এরকম বহু অংশে বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনচিত্র পরিস্ফুট। বাঙালীর জীবনাচরণ, তার ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনা তাঁর চিত্রিত চরিত্রগুলিতে রূপায়িত। বাঙালীর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ব্যাসের মহাভারতকে রূপান্তরিত করেছেন —তাই তাঁর ভারত-কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত বাঙালীর এক জাতীয় মহাকাব্য। কাশীরাম বাংলার জাতীয় কবি। তাঁর মহাভারত বাঙালীর মহাভারত।

অনুবাদগ্রন্থে মূলের কাব্যসৌন্দর্য বজায় রাখতে হয়, ফলে অনুবাদকের কবিত্বশক্তি প্রকাশের তেমন অবকাশ থাকে না। তবু অনেক স্থলে কাশীরামের কবিত্ব ও রচনা-শক্তির প্রকাশ দেখা যাবে। যেমন, সভাপর্বে দ্রৌপদীর অপমান দেখেও ভীম আত্ম-সংযম করতে বাধ্য হয়েছেন—কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন এরূপ—

বৃকোদর শুনিয়া কর্ণের কটূত্তর।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে কচলে করে কর॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী।
কর্ণপানে চাহি গর্জে যেন কাদম্বিনী॥

ক্রোধে রাঙা ভীমের দুটি চোখকে লাল কুমুদিনীর সঙ্গে তুলনায় যে কবিত্বময়তা ফুটে উঠেছে, তা প্রশংসনীয়। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনায় কবির কবিত্ব ক্লাসিকধর্মিতায় উজ্জ্বল—

সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটমণি কিরীটভূষণ॥

তৎসম শব্দপ্রয়োগে এই অংশ গীতার কৃষ্ণের বিশ্বরূপবর্ণনার সমতুল্য হয়ে উঠেছে।

কেবল কাব্য হিসেবে নয়, লোকশিক্ষার গ্রন্থ হিসেবেও কাশীদাসী মহাভারত বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। এই গ্রন্থ সাধারণ মানুষের মধ্যে অতিথিসেবা, জীবে দয়া, পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের মহিমা প্রচার করেছে, তাদের শিখিয়েছে ধর্মপ্রাণতা, সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরভক্তি। রাজসভা থেকে দরিদ্র মুদীর দোকান পর্যন্ত এর একচ্ছত্র অধিকার। কাশীরাম লোককান্ত কবি। 'হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্' বলে মহাকবি মধুসূদন তাঁর যে প্রশস্তি করেছেন তা সর্বতোভাবে যথার্থ।

আরাকান রাজসভার প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা

আরাকান পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ব্রহ্মপ্রদেশের নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ। আরাকানের রাজারা ছিলেন 'মগ' অর্থাৎ বর্মীজাতীয় মানুষ, ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। বহুকাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে আরবদেশীয় মুসলমান বণিকদের যাতায়াত ছিল। ফলে বাংলাদেশে মুসলমানদের আসার আগেই সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত চট্টগ্রামে আরবীয় মুসলমানদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। তাঁদের অনেকেই বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলে গ্রহণ করেছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সন্নিহিত অঞ্চল বলে সেখানেও তাদের প্রভাব ছড়িয়েছিল। নিজ নিজ প্রতিভার গুণে কোন কোন মুসলমান রাজসভায় অমাত্য, সেনাপতি প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এই অমাত্য ও সেনাপতিদের প্রেরণায় এবং উৎসাহে মুসলমান কবিরা বাংলা ভাষায় কাব্যরচনায় প্রণোদিত হয়েছিলেন। এঁদের রচিত কাব্য বাংলাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র নূতন ধারার সূচনা করেছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর কাহিনী প্রধান ছিল, মানুষের কথা ছিল নিতান্ত গৌণ। আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিরাই সর্বপ্রথম মধ্যযুগের দেবমাহাত্মপূর্ণ কাব্যরচনার গতানুগতিকতা ভঙ্গ করে রক্তমাংসের মানুষের রোমান্টিক প্রেমগাথা রচনা করলেন। এদিক থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এঁরা অবিস্মরণীয়।

দৌলতকাজী

কবিকথা॥ দৌলতকাজী আরাকান-রাজসভার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি। মাত্র একখানি কাব্য (তাও অসম্পূর্ণ) রচনা করে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। কবির ব্যক্তিপরিচয় তেমন স্পষ্ট জানা যায় না। কবি সূফী মতাবলম্বী ছিলেন। চট্টগ্রামে জন্ম হয়। অল্প বয়সেই বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন, কিন্তু স্বদেশে সমাদর না হওয়ায় তিনি আরাকান-রাজদরবারে আসেন। আরাকানের রাজা তখন শ্রীসুধর্ম। এই শ্রীসুধর্মের 'সমরসচিব' ছিলেন আশরাফ খান। এঁরই নির্দেশে এবং প্রেরণায় দৌলতকাজী 'সতী ময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনায় রত হন। কিন্তু কাব্যটি সম্পূর্ণ করার আগেই তাঁর দেহান্তর ঘটে। আরাকান-রাজসভার আর এক মহাকবি সৈয়দ আলাওল সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে অসম্পূর্ণ কাব্যটি সমাপ্ত করেন। দৌলতের কাব্যরচনা-কাল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি হবে।

কাব্যকথা॥ 'সতী ময়নামতী' দৌলতকাজীর মৌলিক রচনা নয়। এটি 'মিয়াসাধন' নামক জনৈক হিন্দী কবির লেখা 'মৈনা কো সত্' নামক কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ। নিছক অনুবাদ বলা সঙ্গত হবে না। মিয়াসাধনের কাব্যকাঠামোকে আশ্রয়

করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এটি রচনা করেছেন। কাব্যকাহিনী সংক্ষেপে এই—

নায়ক লোর অপূর্বসুন্দরী ময়নাকে বিয়ে করে সুখে দিন কাটাতে থাকে। একদিন তাঁর হঠাৎ বনে যাবার ইচ্ছা জাগে। রাণী ময়না এবং বৃদ্ধ পাত্রদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে লোর বনে গেল। বনে এক যোগীর কাছে গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রানীর প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হল এবং তাকে লাভের জন্য গোহারী রাজ্যে যাত্রা করল। চন্দ্রানীর বিয়ে হয়েছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামনের সঙ্গে। রাজান্তঃপুরের সব বাধা ডিঙিয়ে লোর চন্দ্রানীর সঙ্গে মিলিত হল। মৃগয়া থেকে বামনের ফেরার কথা শুনে চন্দ্রানী লোরের সঙ্গে রাজপুরী ছেড়ে পালাল। বামন এ সংবাদ শুনে তাদের পিছু নিল এবং গভীর অরণ্যে লোরের সঙ্গে সংগ্রামে নিহত হল। যুদ্ধ যখন শেষ হল, চন্দ্রানী ততক্ষণে সর্পাহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। চন্দ্রানীর শোকে লোর বিহ্বল হয়ে পড়ল, কিন্তু এক ঋষি এসে চন্দ্রানীকে বাঁচিয়ে তুলল। ইতিমধ্যে গোহারী রাজ্যের দূত এল সচন্দ্রানী লোরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে। লোর ও চন্দ্রানীর বিয়ে হল এবং রাজারাণীরূপে তারা সুখে দিন কাটাতে লাগল।

এদিকে সতীময়নার বিরহদুঃখের শেষ নেই। এই বিরহ-বর্ণনা শতধারায় উৎসারিত হয়েছে বারমাস্যার মধ্য দিয়ে। স্বামীর মঙ্গলকামনা করে হরগৌরীর নিত্যপূজা করে ময়নামতী কিন্তু স্বামীর কোন সংবাদ পায় না। এদিকে ময়নার অপরূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ হল রাজপুত্র ছাতনা। রত্নামালিনী ছাতনার কুপ্রস্তাব জানাল ময়নামতীর কাছে।

এখানেই কবির লেখনী মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে যায়। অতঃপর কবি আলাওল অসম্পূর্ণ কাব্যখানি সমাপ্ত করেন এভাবে—

ময়নামতী কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রত্নামালিনীকে তাড়িয়ে দিল চরম শাস্তি দিয়ে। তারপর এক সখীর পরামর্শে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে রাজা লোরের কাছে পাঠাল। ব্রাহ্মণ কৌশলে লোরের হৃদয়ে ময়নার কথা জাগিয়ে তুলল। ময়নার কথা স্মরণ করে অধীর হয়ে পড়ল লোর। এদিকে লোর-চন্দ্রানীর একটি ছেলে হয়েছিল। তার উপরে গোহারী রাজ্যের শাসনভার দিয়ে চন্দ্রানীকে নিয়ে লোর ফিরে এল স্বদেশে। তারপর দুই রাণীকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল। বৃদ্ধ বয়সে লোরের মৃত্যু হলে দুই রাণী তার সঙ্গে অনুমৃতা হয়ে পরলোকগমন করল। এখানেই কাব্যের পরিসমাপ্তি।

দৌলতকাজীর রচিত অংশে যেরূপ সংহতি ও দৃঢ়পিনদ্ধতা আছে, সৈয়দ আলাওলের সংযোজিত অংশে তা নেই। তাঁর গল্পের বাঁধুনি শিথিল, অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনায় ভারাক্রান্ত। দৌলতকাজীর রচনাংশ সৃষ্টিশীলতায় উজ্জ্বল। গীত-গোবিন্দের আদর্শে বাংলা ও সংস্কৃত পদ মিশিয়ে পদ রচনা করে তিনি যে মনোরম

কবিত্বসৃষ্টি করেছেন, তা প্রশংসার্হ। চরিত্রচিত্রণে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখ্য। ময়নার সতীত্ব, প্রলোভনের সামনে অবিচল পতিনিষ্ঠা, পলাতক স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিষয় কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সতী ময়নার আদর্শ চরিত্র অপেক্ষা চন্দ্রানীর কামনা-বাসনাতুর নারীরূপ সমধিক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কবি ময়নার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু তাঁর অন্তরের প্রীতিধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে চন্দ্রানী। দৌলতকাজীর মহৎ কবিকল্পনা অনুভূতির গভীরতায় এবং সরস রচনারীতিতে তাঁর কাব্যটিকে সার্থক শিল্পমূল্যে মণ্ডিত করে তুলেছে। ধর্মসংস্কারমুক্ত (secular) মানবীয় প্রণয়কাব্যরচনার প্রথম নিদর্শন হিসেবে তাঁর 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতী ময়নামতী' বাংলা সাহিত্যে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সৈয়দ আলাওল

কবিকথা॥ দৌলতকাজীর পরেই আরাকান-রাজসভার কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন সৈয়দ আলাওল। কবিত্বশক্তিতে দৌলতকাজীর সমানধর্মা না হলেও তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা, ফারসী, আরবী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। কবি হয়েও তিনি ছিলেন সুনিপুণ যোদ্ধা। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে আলাওলের জন্ম হয়। কবির পিতা ফতেহাবাদের মজলিস-কুতুবের মন্ত্রী ছিলেন। একসময় জলপথে যাত্রাকালে কবি পিতাসহ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। জলদস্যুদের হাতে পিতার মৃত্যু ঘটে। কবি নানা দুর্দশার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত আরাকান রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল কবিকে আরাকানের কারাগৃহে বিনা দোষে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। রাজমন্ত্রী মাগনঠাকুরের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর শ্রেষ্ঠকাব্য 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। পদ্মাবতী ছাড়াও কবি (১) সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল, (২) হপ্তপয়কর, (৩) তোহ্ফা ও (৪) সেকান্দরনামা—এই চারিটি গ্রন্থ লেখেন। সবগুলিই অনুবাদ—দৌলতকাজীর লোরচন্দ্রানীর শেষাংশ সমাপ্ত করা ছাড়া কবি আর কোন মৌলিক রচনায় হাত দেননি।

কাব্যকথা॥ একাধিক রচনা থাকলেও পদ্মাবতী কাব্যের জন্য আলাওল বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কাব্যকাহিনী সংক্ষেপে এরূপ—

রত্নসেন চিতোরের রাজা ছিলেন। তাঁর রাণীর নাম নাগমতী। সিংহলের রাজকন্যা পদ্মিনী বা পদ্মাবতীর রূপলাবণ্যের কথা শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যোগীর বেশে সিংহল যাত্রা করেন। নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করে পদ্মিনীকে লাভ করেন ও স্বদেশে ফেরেন। দুই স্ত্রী নিয়ে রত্নসেনের সুখে দিন কাটছিল। এমন সময়ে দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে চিতোর আক্রমণ করেন এবং পরাজিত রাজাকে বন্দী করে নিয়ে দিল্লী ফিরে যান। গোরী ও বাদিনা নামে রাজার দুই ভাই রত্নসেনকে

উদ্ধার করে আনে। এদিকে রত্নসেনের অবর্তমানে রাজা দেওপাল পদ্মাবতীকে বিপথ-গামিনী করার চেষ্টা করে। রত্নসেন ফিরে এসে যুদ্ধে দেওপালকে হত্যা করে কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেও আহত হয়ে মারা যান। পদ্মাবতী ও নাগমতী স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা হন। এদিকে আলাউদ্দিন চিতোরে পুনঃপ্রবেশ করলেন কিন্তু পদ্মাবতীর পরিণতি প্রত্যক্ষ করে চিতার উপরে প্রণাম জানিয়ে দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

'পদ্মাবতী' আলাওলের মৌলিক রচনা নয়। এটি প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। তবে অনুবাদ হলেও আলাওলের স্বাধীন কবিকল্পনার স্বাক্ষর এতে রয়েছে। কবি মূলের কোন কোন অংশ বাদ দিয়েছেন। কিছু নতুন অংশ জুড়েছেন। আবার মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অংশকে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত বাড়িয়ে তুলেছেন। এই পরিবর্তন-পরিবর্ধনে মূলের মহিমাতো ক্ষুণ্ণ হয়নি বরং রূপলাবণ্যে তা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কাব্যের মূল বিষয় চিতোর-সুন্দরী পদ্মিনী ও দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিনের উপাখ্যান ইতিহাস থেকে গৃহীত। কাব্যটিতে ইতিহাসের চেয়ে অবশ্য কল্পনারই প্রাধান্য বেশী। কবি জায়সী মূলে কাব্যটিকে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক হিসেবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু আলাওল এই রূপকরীতি গ্রহণ করেননি। দেবলীলা নয়, পৌরাণিক জীবনকথা নয়, সত্যকার ইতিহাসের বাস্তব মানবজীবনকথা এ কাব্যের অবলম্বন। পদ্মাবতী প্রকৃতই রোমান্টিক ঐতিহাসিক কাব্য।

কবি সৈয়দ আলাওল ছিলেন সূফী মতের উপাসক। আদর্শ সূফীভাবুকের মত তিনি ছিলেন প্রেম-সত্যের চরম মূল্যে বিশ্বাসী। 'পদ্মাবতী' কাব্যের সূচনাতেই কবি প্রেমের বিজয়মহিমা ঘোষণা করেছেন—

প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ॥...
প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেমতুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর॥

কেবল প্রেমতত্ত্ব প্রচারে নয়, প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্রচিত্রণেও গভীর প্রেমাদর্শ নিপুণ-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যখন সিংহলরাজ রত্নসেনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করলেন, তখন রত্নসেন বলে উঠেছেন—

আজু সে নিয়মধর্ম নির্বাহ হইব।
প্রিয়তমা স্মরি আজি জীবন তেজিব॥

'পদ্মাবতী' কাব্য প্রেমশতদলের অপূর্ব সুরভিতে মেদুর।

সৈয়দ আলাওল তাঁর কাব্যে চিত্ররচনায় ও গীতিরস-সৃজনে অসামান্য দক্ষতা

দেখিয়েছেন। সমুদ্রে নৌকাডুবি হলে স্বামীসঙ্গীহীনা পদ্মাবতী যে বিলাপ করেছে, তাতে গীতিকবিতার স্বর অপরূপ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ আলাওলের অবিস্মরণীয়তার মূলে রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মাবতী'। এতে ধর্মসংস্কার-মুক্ত (secular) মানবিকতার এমন একটি ভাবলোক সৃষ্ট হয়েছে, যা মধ্য যুগে দুর্লক্ষ্য। 'সায়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল কাব্যের বিষয় মিশরের রাজপুত্র সায়ফুলমুলুকের সঙ্গে পরী-রাজ্যের সুন্দরী বদিউজ্জমালের প্রণয় ও মিলন। এতে অনেক আজগুবি কাহিনী আছে—মানবিকতার জন্য কাব্যটি উল্লেখ্য।

'হপ্তপয়কর' কাব্যের উপাদান ফারসী কাব্য থেকে নেওয়া। 'পয়কর' অর্থে গল্প। এতে হপ্ত অর্থাৎ সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলিতে তেমন কোন উচ্চ কবিকল্পনা নেই—নিছক আনন্দ দেওয়াই বোধ হয় এগুলির উদ্দেশ্য। 'তোহফা' কাব্য নয়। একটি ধর্মীয় উপদেশের গ্রন্থমাত্র। সেকান্দরনামা কবির সর্বশেষ রচনা। এতে ইতিহাসের বিখ্যাত বীর সেকান্দর বা আলেকজাণ্ডারের কীর্তিকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পদ্মাবতীর তুলনায় আলাওলের এ রচনাগুলি দুর্বলতর। এগুলির বিষয়বস্তু ইসলামধর্ম ও মুসলমান-সমাজ ঘেঁসা হওয়ায় হিন্দুসমাজে তেমন পরিচিতিও নেই। তবুও তাঁর এই সব রচনাতে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জাতীয় চেতনার অস্ফুট আভাস চমৎকার ধরা পড়েছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আলাওল অদ্বিতীয় স্রষ্টা না হলেও নবচেতনার প্রভাত-তারকা।

আরাকান-রাজসভার দুই কবি দৌলতকাজী ও আলাওলের কবিপ্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের রচনায় এই ধূলিধূসরিত ধরণীর রক্তমাংসের মানুষের প্রেম-ভালবাসা, সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। এই মানবিকতা সে যুগের সাহিত্যে নেই বললেই চলে। আর এ কারণেই তাঁদের রচনা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।

ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যধারার শেষ কবি এবং প্রতিভাধর কবি। বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের যখন আবির্ভাব ঘটে তখন অষ্টাদশ শতাব্দী। এই শতাব্দীতে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ মোটেই স্বস্থ ছিল না। এ যুগ অবক্ষয়ের যুগ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদে ভাঙন ধরে। বাংলার সুবেদাররা যথেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। ভোগবিলাসের প্রমত্ততায় তারা মেতে ওঠে, নৈতিক চেতনার অধঃপতন ঘটে। দেশে শাসন নেই, আছে শোষণ। অত্যাচারে আর অরাজকতায় সাধারণ মানুষ বিপন্ন। মানুষের মন থেকে আত্মবিশ্বাস দূরীভূত হচ্ছে, দেবতার উপর আস্থা কমে যাচ্ছে। তার উপর নাগরিক জীবনের চাকচিক্য, আড়ম্বর উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছে মানুষকে। এ ধরণের পরিবেশে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হওয়ায় তাঁর কাব্যে সমকালীন যুগের প্রতিফলন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল, কেননা সাহিত্য সমাজজীবনেরই দর্পণ।

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি ছিলেন। রাজসভার ঐশ্বর্য এবং আড়ম্বর, কৃত্রিম ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রা, নৈতিক শৈথিল্য, ধর্মবিশ্বাসহীনতা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে কবির কাব্যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিলাসউল্লাস, চটুলতা ইত্যাদি অনিবার্যরূপে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর কাব্যে জীর্ণ-পুরাতন আদর্শ ও প্রথা অস্বীকৃত হয়েছে, বিদ্ধ হয়েছে তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে। মধ্যযুগের দেবমাহাত্ম্যনির্ভরতা কবির নেই, তাঁর কাব্যে দেবতা মানুষ হয়ে উঠেছে। যে ভক্তিবাদ মঙ্গলকাব্যের নেপথ্যচারী মূলশক্তি, ভারতচন্দ্রে তা দেখা যাবে না। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত তিনি দেবতার বন্দনাগান গেয়েছেন, দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা বলেছেন, হরপার্বতীর সুখদুঃখের ছবি এঁকেছেন এবং অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। তথাপি, কবির কাব্য প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ নয়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—দৈবশক্তির জন্য নয় বা দৈবাদেশেও নয়, তাঁর মঙ্গলকাব্যের রচনা—'কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে…রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।' দেবী-মাহাত্ম্য প্রচারের চেয়ে তাঁর কাব্যে প্রতিপালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। মর্ত্যমমতামেদুর মানবজীবনচেতনার প্রকাশ তাঁকে আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। তাঁর কাব্যে ঘটেছে মধ্যযুগের বিলয় এবং আধুনিক যুগের সূচনা। তিনি যুগসন্ধিক্ষণের কবি।

কবিকথা॥ দক্ষিণরাঢ়ের ভুরশুট পরগণার একটি জমিদার পরিবারে ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম নরেন্দ্র-নারায়ণ রায়। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নিজ মনোমত পাত্রীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের জন্য গুরুজনদের দ্বারা ভর্ৎসিত হলে তিনি একাকী গৃহত্যাগ করেন এবং

হুগলীর কাছে এক গ্রামে কয়েক বছর বাস করেন। এখানে থাকাকালে তাঁর সংস্কৃত, ফারসী ভাষায় শিক্ষালাভ ঘটে। তাঁর প্রথম দুখানি কাব্য 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' এখানেই লেখা হয়। যাই হোক, ফারসী ভাষায় পণ্ডিত হয়ে ভারতচন্দ্র গৃহে ফেরেন। গৃহে প্রত্যাগমনের পর তাঁর পিতা তাঁকে বর্ধমানরাজের অধীনে পত্তনি জমিদারি মৌজা দেখাশুনার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু বর্ধমান-রাজসরকারের দেওয়ানের চক্রান্তে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং কারাগার থেকে কোনক্রমে পালিয়ে উড়িষ্যার দিকে চলে যান। প্রথমে কটকে পরে পুরীতে গিয়ে কিছুকাল থাকেন। পরে এক বৈষ্ণবদলের সঙ্গে বৃন্দাবনযাত্রা করেন কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর এক নিকট-আত্মীয় তাঁর পরিচয় জানতে পেরে তাঁকে হুগলী জেলার খানাকুলে শ্বশুরালয়ে নিয়ে আসেন। স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রেখেই ভারতচন্দ্র ভাগ্য-অন্বেষণে চন্দননগরে আসেন এবং ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাজে নিযুক্ত হন। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ভারতচন্দ্রের যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ৪০ টাকা মাসোহারা দিয়ে সভাকবি নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে ভূমিদান করে গঙ্গাতীরে মূলাজোড় গ্রামে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। অসাধারণ কবিপ্রতিভার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আটচল্লিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

কাব্যকথা ॥ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র প্রথমে 'রসমঞ্জরী' নামে কাব্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ এবং 'নাগাষ্টক' নামে এক দ্ব্যর্থবোধক কাব্য এবং পরে বহুবিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কবি নিজের সম্পর্কে বলেছেন—'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে'। কথাটিতে আতিশয্য নেই।

অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। কবি এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি 'অন্নদামঙ্গল', দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর', তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ'। প্রথম খণ্ডকে যথার্থ অন্নদামঙ্গল বলা চলে।

অন্নদামঙ্গলের সূচনায় আলিবর্দি কর্তৃক ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাগারে নিক্ষেপ এবং কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অন্নপূর্ণা পূজা করে বিপদ থেকে উদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর কবি শিবপুরাণাদি অবলম্বনে দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়গৃহে উমারূপে জন্ম এবং হরপার্বতীর বিবাহের বর্ণনার পর কাশীধামে অন্নপূর্ণার অধিকারের বর্ণনা করেছেন। তারপর ব্যাসকাহিনী। অন্নপূর্ণার কাশীর মহিমা ক্ষুণ্ণ করে নতুন কাশী নির্মাণের প্রচেষ্টায় ব্যাস কিভাবে ব্যর্থ হলেন তার বিবরণ কবি দিয়েছেন। কাশীধামে দেবীর মহিমা স্থাপনের পর তিনি মর্ত্যের অন্য স্থানে শিবপূজা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হলেন এবং কুবেরের অনুচরকে অভিশাপ দিয়ে হরিহোড়

নাম নিয়ে এক দরিদ্রের গৃহে জন্মাতে বাধ্য করলেন। হরিহোড় মর্ত্যে দেবীর পূজা-প্রচার করলেন কিন্তু বার্ধক্যে তরুণী ভার্যা গৃহে এনে মহা অশান্তি সৃষ্টি করায় দেবী তাঁকে ত্যাগ করে ভবানন্দ মজুমদারের ভবনে অধিষ্ঠিত হলেন। ভবানন্দ কবির প্রতি-পালক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। তিনি মোগলের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন। এই হল প্রথম খণ্ডের কাহিনী।

মানসিংহের বাংলাদেশে আগমন এবং বর্ধমানে সুন্দরকৃত সুড়ঙ্গদর্শনপ্রসঙ্গে 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীটি মানসিংহের কাহিনীর সঙ্গে ক্ষীণভাবে যুক্ত হয়েছে। সংস্কৃতকাব্য 'চৌরপঞ্চাশৎ' অবলম্বনে রচিত হলেও বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনী রচনায় ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব উল্লেখ্য। ভারত-চন্দ্রের পূর্বে ও পরে অনেকে বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখলেও ভারতচন্দ্রের রচনার কাছে সেগুলি ম্লান, নিষ্প্রভ। রাজপুত্র সুন্দর দেবীভক্ত। রাজকন্যা বিদ্যাকে গোপনে লাভ করে সে প্রাণ হারাতে বসেছিল। ভক্তবৎসলা দেবী মশানে সুন্দরকে বাঁচালেন। এদিক থেকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ভক্তবিজয়গাথা, সুতরাং তা মঙ্গলকাব্যের আওতায় আসে। এই কাহিনীকাব্যের নামান্তর 'কালিকামঙ্গল' এবং বিধ ধারণার পরিপোষক।

তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ'। মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় যশোররাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করে তাঁকে খাঁচায় ভরে নিয়ে চললেন বাদশাহকে উপহার দেবার জন্য। ভবানন্দকে দিল্লী দরবারে পুরস্কৃত করার ইচ্ছায় মানসিংহ তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে দিল্লী চললেন। পথিমধ্যে প্রতাপাদিত্যের দেহান্ত হল। মানসিংহ তখন প্রতাপের মৃতদেহ ঘিয়ে ভেজে শুকনো করে নিয়ে চললেন। বাদশাহ খুশী হলেন কিন্তু যখন শুনলেন যে, অন্নপূর্ণার কৃপাধন্য ভবানন্দ মজুমদারের সাহায্যে এই জয় সাধিত হয়েছে, তখন তিনি হিন্দুর দেবী অন্নপূর্ণার উদ্দেশ্যে কটূক্তি করলেন। ভবানন্দ তার প্রতিবাদ করলে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। মানসিংহ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে দুঃখিতমনে স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু এ ঘটনার পরমুহূর্তে দিল্লীতে আমীর-ওমরাহ এবং বাদশাহ খুবই বিপদে পড়লেন। দেবীকে অপমান করায় দেবীর অনুচর ভূতপ্রেতেরা দিল্লীশহর ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। মুসলমানদের মারধোর ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তখন বাধ্য হয়ে জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে এবং অন্নদার পূজা করে বিপদ থেকে মুক্ত হলেন। 'রাজা' উপাধি নিয়ে ভবানন্দ দেশে ফিরলেন এবং খুব ঘটা করে অন্নপূর্ণার পূজা প্রচার করে পরিশেষে স্বর্গারোহণ করলেন। এখানেই তৃতীয় খণ্ডের মঙ্গলকাব্যোচিত সমাপ্তি। বস্তুত দেবভাবনা এখানে নামমাত্র। কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার কীর্তিকাহিনীর প্রচারকল্পে এ অংশ রচিত। মানুষের ইতিহাসকে কাব্যের বিষয়রূপে

গ্রহণ করায় কবির আধুনিক মনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কবি সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, পুরাণ-তন্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল সুপ্রচুর। ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা, অধ্যয়নের বিস্তার, ভাষাজ্ঞানেব ব্যাপকতা তাঁর কাব্যের মধ্যে নানা ভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে। ছন্দোরচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রাদি থেকে আহৃত ছন্দ ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক ইত্যাদি তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। নিম্নলিখিত—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভবম্ ভম্ ভবম্ ভম্ শিঙা ঘোর বাজে॥
... ...

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে॥— ইত্যাদি রচনাংশে তার পরিচয় স্পষ্ট। সতীহারা শিবের রোষ 'ভুজঙ্গপ্রয়াতে' অপরূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর মত ছান্দসিক কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

মঙ্গলকাব্যের ঘটনামুখর কাহিনীতে গীতিকবিতার অবসর কম ছিল। অবশ্য মঙ্গলকাব্যের বিষ্ণুপদের মাধ্যমে মাঝে মাঝে গীতঝঙ্কার শোনা গেছে। কিন্তু তা সার্থকভাবে আপন রসমাধুর্যে ঝঙ্কৃত হয়েছে ভারতচন্দ্রের হাতে। এই গীতিকবিতা রচনার মধ্যে ভারতচন্দ্রের আধুনিকপ্রাণ কবিমানসটি সুন্দরভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্য এক নতুন মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের বাহ্যরূপটি অনুসরণ করলেও কবি তাঁর প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দীপ্ত আলোকে এক নবতর মহিমায় এটিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। তাঁর চিত্রিত দেবদেবীতে দৈবীমহিমা অপেক্ষা মানবোচিত গুণের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর শিব, অন্নপূর্ণা, নারদ, ব্যাসদেব, গঙ্গা সকলেই মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। শিবের বিবাহযাত্রা, বৃদ্ধ বর দেখে মেনকার বিলাপ, নারদের প্রতি রোষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার, বিবাহ-সভায় শিবের আচরণ, গঙ্গা-ব্যাসদেবের ব্যক্তিগত কোন্দল প্রভৃতির মধ্যে নামমাত্রও দেবত্বের গন্ধ নেই। বস্তুত কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কৌতুকরসোচ্ছল দৃষ্টি দিয়ে দেবতাদের লক্ষ্য করেছেন। তাঁর দেবদেবীর পরিকল্পনা আমাদের পৌরাণিক সংস্কারকে আঘাত করে ঠিকই তবে দেবতাকে মানব করে যে অভিনব আদর্শের সূচনা করেন তার মধ্য দিয়েই ঘটেছে অন্নদামঙ্গলে তথা বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতার শুভ অভ্যুদয়।

ভারতচন্দ্র হাস্যরসিক কবি। বিবাহসভায় শিবের আচার-আচরণ, দিল্লীতে ভূতপ্রেতের অত্যাচার, শিবপার্বতীর কোন্দল ইত্যাদিতে হাস্যরসের উৎসার লক্ষণীয়। তবে তাঁর হাসিতে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর নায়ক-

নায়িকা, হীরামালিনী, কোটাল, চৌকিদার, এমন কি কালিকা দেবী পর্যন্ত কম বেশী ব্যঙ্গস্পৃষ্ট।

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি ছিলেন। ফলে নাগরিক-জনোচিত বাক্‌সংযম ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তাঁর রচনায় অনিবার্যভাবে লক্ষণীয়। ক্রান্তদর্শী ভারতচন্দ্র কবিদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন, রসই কাব্যের প্রাণ—'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' তাই রসসৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি 'যাবনীমিশাল' ভাষার প্রয়োগে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি—

ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব।
কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব ॥
আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায় ॥

এই অনবদ্য ভাষা-শিল্পসৃষ্টির অনন্যতার জন্যই তাঁর রচনার বহু অংশ প্রবচন বা সুভাষিতের মর্যাদা পেয়েছে। 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে,' 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ' ইত্যাদি তার পরিচয়বহ। ভারতচন্দ্রের কাব্য ভাষার তাজমহল। যথোপযুক্ত ছন্দে ও সুললিত শব্দপ্রয়োগে ধ্বনিসঙ্গীত-সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অসামান্য কুশলী। ভারতচন্দ্র একজন নিষ্ঠাবান শব্দশিল্পী।

অলঙ্কার রচনায় কবির কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। কাব্যে বিন্যস্ত অলঙ্কারগুলির ঔজ্জ্বল্য অসাধারণ। কবির শ্লেষ অলঙ্কার প্রয়োগের অপূর্ব নিদর্শন নিম্নলিখিত—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥—ইত্যাদি ছত্রে নিহিত।

কবির রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের সার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অজস্র। বিদ্যার রূপ-বর্ণনায়—

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা ॥

—এই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের চমৎকার প্রয়োগ আমাদের বিমুগ্ধ করে।

ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের কবিকৃতির দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছেন, তবে কাব্যের কলাসমৃদ্ধ রূপসৃষ্টি একান্তভাবে তাঁর নিজস্বই। ভারতচন্দ্র শিল্পনৈপুণ্যে সার্থক —সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর মত কারুকৃৎ দ্বিতীয় রহিত।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে চরিত্রসৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র তেমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"ভারতচন্দ্রের কাব্যে কোনো রক্তমাংসের ব্যক্তিমানুষ নেই। সব চরিত্রই টাইপ,

তাহারা মুখের কথার মানুষ।" তথাপি বলা চলে, ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রসৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রতিভার অগ্নিস্বাক্ষর রয়েছে। দেবীর কাছে ধন নয়, মান নয়—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এই সুকরুণ প্রার্থনায় ঈশ্বরী পাটনীর বাস্তব মানবিক রূপটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রার্থনার মধ্যে শুধু ঈশ্বরী পাটনীর নয়, 'অনাদিকালের দৈবহত মূক দরিদ্র নরনারীর চিরকালের স্নেহব্যাকুলতা প্রতিষ্ঠিত।' তাঁর অঙ্কিত হীরা মালিনী নিছক 'টাইপ' না হয়ে জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। রসের মালিনী হীরা রাজবাড়ীতে ফুল যোগায়। এখন সে গলিতযৌবনা, কিন্তু—

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥

তার বেসাতি বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার দূতীগিরি, ধূর্ততা প্রভৃতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। রানীর চরিত্রও বাস্তবের প্রাণোত্তাপে জীবন্ত।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিরুদ্ধে কেউ কেউ অশ্লীলতার অভিযোগ করেন। "অন্নদামঙ্গল নির্দোষ গ্রন্থ নহে। অশ্লীলতা তাহার মহদ্ দোষ।" মন্তব্যটির মধ্যে যথার্থতা আছে সন্দেহ নেই কিন্তু সে অশ্লীলতা কবির শিল্পসুষম ভাষা ও সুচারু অলঙ্কার-প্রয়োগের কৌশলে অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে। "ভাষাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা ভারতচন্দ্রে একেবারেই নাই, তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে, তা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা।"

তাঁর কাব্যে ভাবগভীরতা ও কল্পনাসমুন্নতির অভাব দেখা যাবে। রতিবিলাপ ও সুন্দরের মশানে কালীস্তবের মধ্যে করুণ ও ভক্তিরস সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

তথাপি, কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এক অপরূপ শিল্প-সুষমায় ভাস্বর অনন্য কবিকর্ম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলগান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" ছন্দের অপূর্ব ব্যবহার, ভাবোপযোগী ধ্বনিময় শব্দের প্রয়োগ, উজ্জ্বল মার্জিত রচনারীতি, কৌতুকরসের প্রসন্নতা অন্নদামঙ্গলকে যথার্থই রাজকণ্ঠের মণিমালা করে তুলেছে।

পয়ার-লাচাড়ীর বাঁধাধরা প্রয়োগে বাংলা কাব্যের গঠনরীতি শিথিল হয়ে পড়েছিল, ভারতচন্দ্রের মণ্ডনকলাঋদ্ধ বাণীবিন্যাসে তা অপূর্ব বলিষ্ঠতায় দৃঢ় হয়ে উঠেছে। মন্দস্রোতা বাংলা কাব্য-স্রোতস্বিনীতে আবার এসেছে জোয়ার, এসেছে গতি, শোনা গেছে অসীম সমুদ্রের উদাত্ত কলকল্লোল। ভারতচন্দ্রের কাব্যসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য এখানেই। এখানেই তাঁর সার্থকতা এবং সিদ্ধি-সীমা।

সামাজিক পটভূমিতে শাক্ত পদাবলী এবং বাউল গান

শাক্ত পদাবলী

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য মোটামুটি দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল—(১) আখ্যান-কাব্য ও (২) গীতিকাব্য। আবার গীতিকাব্যস্রোত প্রধানত দুটি ধারায় বয়ে চলেছিল—(১) বৈষ্ণব পদাবলী ও (২) শাক্ত পদাবলী। রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে যেমন বৈষ্ণব পদাবলী সৃষ্ট হয়েছিল, তেমনি উমাপার্বতী কালিকাকে কেন্দ্র করে অতি চমৎকার গান রচিত হয়েছিল, তাই শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিত। আধুনিক কালে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে 'শাক্ত পদাবলী' নামকরণ করা হয়েছে।

বৈষ্ণব কবিতা প্রথম থেকেই গীতিকাব্যের ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে আর শাক্ত কবিতা বর্ণনামূলক মঙ্গলকাব্যের ধারায় নিজেকে প্রকাশ করেছে। বাংলা দেশে যে সুস্থির জীবনস্রোত বয়ে চলেছিল, তা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত হয়। মুসলমানদের অত্যাচারে বাঙালী ভয়ঙ্কর দুর্দশার সম্মুখীন হল। দেশে তখন কোন প্রবল হিন্দু রাজশক্তি ছিল না যার কাছে বরাভয় মিলতে পারে। ভীতসন্ত্রস্ত জাতি এমন শক্তিধরকে পেতে চাইল যার কাছে বরাভয় মিলতে পারে। দেবতার মধ্যে তারা এই বরাভয়দায়ীর সন্ধান পেল এবং দেবতাকে তুষ্ট রাখলে সর্বপ্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন, বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে এই ধারণায় দেবতার মঙ্গলগাথা রচনায় প্রবৃত্ত হল। আদিদেব শিব নিষ্ক্রিয়। তিনি দুর্বলের, বিপন্নের যথাযোগ্য আশ্রয়দানে সক্ষম হবেন না বিবেচনা করে বাঙালী শক্তিদেবীর অর্চনা শুরু করল। বাংলা দেশ তন্ত্র ও শক্তিসাধনার কেন্দ্র। সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণাকে তন্ত্রে আদ্যাশক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি চণ্ডিকা, শিবের গৃহিণী, উমা-পার্বতী। বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে চণ্ডী ও কালিকাকে অবলম্বন করে শক্তিসাধনা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের ফলে সেই শক্তি-সাধনা প্রাধান্য পেল, শক্তিদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে রচিত হল চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল ইত্যাদি কাব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত শাক্ত পদাবলী এই মঙ্গলকাব্যধারারই বিবর্তিত রূপ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের মূলে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে সেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি শাক্ত পদাবলী উদ্ভবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলশাসনের ভিত্তি শিথিল, বাদশাহের নামমাত্র 'সনন্দ' নিয়ে অকর্মণ্য, উচ্ছৃঙ্খল নবাব সিংহাসনে আসীন। রাজকোষে অর্থাভাব, নবাব জমিদারকে অর্থের জন্য চাপ দিচ্ছেন। খাজনা দিতে না পারলে সম্পত্তি নীলামে ওঠে, কারাগারে আবদ্ধ হতে হয়। ফলে জমিদার প্রজার উপর পীড়ন করছেন ; দেশের সর্বত্র অত্যাচার, অবিচার। এই অত্যাচারের মধ্যে দেখা দিল কুখ্যাত বর্গী আক্রমণ। এই

আক্রমণে কারো নিস্তার ছিল না। নবাব, রাজা, মুদী, বেনে, গ্রামবাসী সকলেরই এক অবস্থা। তার উপর মগ ও বিদেশী পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার। এই অত্যাচারে বাংলা দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল একেবারে শ্মশানভূমি হয়ে দাঁড়াল। রাষ্ট্রীয় এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় বাঙালী যখন সঙ্কটাপন্ন, তখন এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বরাভয়দায়ী মাতৃ-চরণকেই আরো প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরল। অনন্তশক্তিময়ী, 'কালভয়-হারিণী' জগজ্জননীর চরণে প্রতিকার প্রার্থনা করল। মঙ্গলকাব্যের দেবীর ভীষণতাকে কোমল মাধুর্যে সিক্ত করে স্নেহময়ী জগজ্জননীর রূপমূর্তির করল প্রতিষ্ঠা। এই স্নেহময়ী জননীর আরাধনা সন্তানহৃদয়ের প্রবল আবেগ ও আকূতির স্পর্শে গীতিকাব্যের ঝঙ্কারে বেজে উঠল। এভাবেই হল শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব। যুগের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মগত প্রেরণা শাক্ত পদাবলী উদ্ভবের মূল প্রেরণা।

শাক্ত পদাবলীকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) উমাসঙ্গীত ও (২) শ্যামাসঙ্গীত। শক্তিস্বরূপিণী মহামায়াকে মাতৃরূপে দেখার ফলে শ্যামাসঙ্গীতের এবং কন্যারূপে দেখার ফলে উমাসঙ্গীতের উদ্ভব। উমাসঙ্গীতের তিনটি অংশ—বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া। উমাসঙ্গীতের প্রথমে উমার বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। তারপর পিতা হিমালয় উমাকে দরিদ্র বৃদ্ধ শিবের হাতে সম্প্রদান করেছেন। বিবাহের পর মেয়ে বহুদিন পিতৃগৃহে আসেনি। আশ্বিনমাসে যখন মেঘ জলভার হারিয়ে লঘুশুভ্র, ঝরা শিউলির গন্ধে বাতাস সুরভিত তখন মা মেনকা কন্যা মিলনের জন্য অধীর হন। মেনকার অনুরোধে হিমালয় উমাকে কৈলাসস্থিত পতিগৃহ থেকে নিয়ে আসেন। মাতাকন্যার মিলন হয়। এই হল আগমনী। বহুদিন পরে মেয়েকে কাছে পেয়ে মেনকা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। তার সঙ্গে বলেন নানা সুখদুঃখের কথা। মনে মনে ভাবেন মেয়েকে কাছে রেখে দেবেন, দরিদ্র স্বামীগৃহে আর পাঠাবেন না। কিন্তু তা কি হয়? তিন দিন যেতে না যেতেই স্বামী শিব উমাকে নিয়ে যাবার জন্য আসেন। দারুণ নবমী নিশি ভোর হয়ে আসে বিজয়া দশমীর বিদায়ক্ষণ। কন্যাকে বিদায় দিতে মা মেনকা ভেঙে পড়েন দুঃসহ কান্নায়। কিন্তু উমাকে শেষ পর্যন্ত যেতে হয়। এই হল বিজয়া। আগমনী ও বিজয়া-র পদে দেবতার কথা নিতান্তই বাঙালীর ঘরের কথা হয়ে উঠেছে। বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন একদিন বাংলাদেশের সমাজে ছিল। আট বছরের শিশুকন্যাকে বিয়ে দিয়ে বাঙালী পিতামাতা দারুণ মনোবেদনা ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতেন। মা-বাবা কেবল যে কন্যার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করতেন তা নয়, কৌলীন্য রাখতে গিয়ে দরিদ্র বৃদ্ধ বরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য হতেন এবং সেজন্যও বেদনা ভোগ করতেন। কন্যাকে কাছে পাবার জন্য তাঁদের অশান্ত আগ্রহ হৃদয়কে আকুল করে তুলত। তাঁরা বৎসরান্তে মেয়েকে কবে বুকের মধ্যে ফিরে পাবেন

তারই অধীর প্রতীক্ষায় থাকতেন। আগমনী ও বিজয়া গানে বাঙালী জননীর কন্যার আগমন পথ চেয়ে ব্যাকুল প্রতীক্ষার ও কন্যাকে ফিরে পেয়ে পুনরায় বিদায় দানের ব্যথাকাতরতার মনোভাবটি মর্মস্পর্শী বাণীরূপ লাভ করেছে। আগমনী ও বিজয়ার গান বাঙালীর অশ্রুসিক্ত সঙ্গীত। শ্যামাসঙ্গীতে শাক্ত সাধকের মাতৃভক্তি ও সাধনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। মায়ের উপর নির্ভরশীল শিশু যেমন স্নেহের দাবীতে আবদার করে, শাক্ত কবিরা তেমনিভাবে শ্যামা মায়ের কাছে আবদার করেছেন, দুঃখবেদনায় দগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে কলহ করেছেন, তাঁকে গালি পর্যন্ত দিয়েছেন। অনুভূতির গভীরতা এবং আবেগের আন্তরিকতায় শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এর ভাষা সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জলতায় পূর্ণ। শাক্ত ও বৈষ্ণপদাবলী উভয়েরই মূল অবলম্বন ভক্তিভাব—কিন্তু শাক্তের সাধনা মাতৃভাবের, বৈষ্ণবের সাধনা কান্তাভাবের। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল ভিত্তি মধুর রস। শাক্ত পদাবলীর প্রধান সম্পদ বাৎসল্যরস। কাব্যগুণে বৈষ্ণবপদাবলী শ্রেষ্ঠ। সমাজচেতনায় এবং মানবরসে শাক্ত পদাবলী বিশিষ্ট।

রামপ্রসাদ সেন

কবিকথা॥ শাক্ত পদাবলীর উদ্গাতা ও শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চব্বিশ পরগণার কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। হালিসহর তাঁর সাধনপীঠ ছিল। পিতার নাম রামরাম সেন। শৈশবেই মাকে হারান। মহাকালীর পরম ভক্ত এবং তন্ত্রসাধক ছিলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যে তিনি কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। প্রবাদ আছে, স্বয়ং কালী কন্যারূপে তাঁকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেন। কবি কলকাতায় কোন ধনাঢ্য জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে গিয়ে হিসাবের খাতায় 'আমায় দে মা তবিলদারী' গানটি লিখেছিলেন বলে তাঁর উর্ধ্বতন কর্মচারী কর্তৃক ভর্ৎসিত হন। একথা জানতে পেরে জমিদার তাঁকে চাকুরী থেকে রেহাই দিয়ে তাঁর মাসোহারা বন্দোবস্ত করে দেন এবং কাব্যচর্চা করে যেতে বলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বোধ হয়, তাঁর কবিত্ব, ভক্তি ও সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন। কবি গৃহী সাধক ছিলেন। তাঁর রচিত গান 'প্রসাদীসঙ্গীত' নামে এবং নিজের গানে তিনি যে সুর দিতেন, তা 'প্রসাদীসুর' নামে প্রচলিত। শোনা যায়, ভক্তকবি শ্যামাপূজার বিসর্জনের দিনে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে প্রাণবিসর্জন দেন।

কাব্যকথা॥ কবি প্রথম যৌবনে 'কালিকামঙ্গল', 'কৃষ্ণকীর্তন' ইত্যাদি কাব্য লেখেন কিন্তু এগুলি তেমন রসোত্তীর্ণ হয়নি। তাঁর অসামান্য সাহিত্যকীর্তি ভক্তিরসোদ্বেল শ্যামাসঙ্গীত। এজন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথিত। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় তিনশো কিন্তু সবগুলি তাঁর রচনা কিনা বলা

যায় না। তাঁর সঙ্গীতগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—১. উমাবিষয়ক (আগমনী ও বিজয়ী), ২. সাধনাবিষয়ক (তন্ত্রোক্ত সাধনা), ৩. দেবীর স্বরূপবিষয়ক এবং তত্ত্ব ও নীতিবিষয়ক। ভাষার সরলতা, সুরের সহজ প্রকাশভঙ্গী এবং ভাবের গভীরতা একত্র মিলিত হয়ে তাঁর সঙ্গীতকে অপূর্ব স্বাদুতা দিয়েছে। এগুলি সাধক-কবির হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত ভক্তির শুভ্র শতদল। কবি আরাধ্যা দেবীকে মহাশক্তি-রূপা জেনেও তাঁকে মঙ্গলময়ী স্নেহাতুরা মর্ত্যজননীরূপে দেখেছেন। সন্তানের মত মায়ের উপর আবদার, অভিমান করেছেন ; সংসারের চাকায় পিষ্ট হয়ে বালকের ন্যায় তাঁর কাছে দুঃখ জানিয়েছেন—

মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছে অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত ॥

বিশ্বসংসারে মা-ই যাঁর সব, মাকে ছাড়া নিজের দুঃখের কথা আর কাকেই বা জানাবেন। ছেলের ডাকে মা কিন্তু নীরব, তাই অভিমানে ক্ষুব্ধ কবি গেয়ে ওঠেন—

ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব।
মা বলে আর কোলে যাব না ॥

মনোব্যথায় কবি মাকে গালমন্দ করতেও ছাড়েননি—

জন্মজন্মান্তরেতে মা কত দুঃখ আমায় দিলে।
প্রসাদ বলে এবার-ম'লে ডাকব সর্বনাশী বলে ॥

একদিকে হতাশামথিত অভিমানের সুর, অন্যদিকে মায়ের প্রতি অচলা ভক্তি ও চরম নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পদে—

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই ॥

মাতৃপদে কবির অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস জননী-সন্তানের অকৃত্রিম সম্পর্কের ভাবতরঙ্গে অপূর্ব দোলায়িত। তাঁর 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা', 'মন রে কৃষিকাজ জান না', 'মলেম ভূতের বেগার খেটে,' 'সামাল সামাল ডুবল তরী' ইত্যাদি গানে ঐহিক এবং পারমার্থিক জীবনের গভীর বেদনা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। এগুলি যেন মায়ের দেওয়া প্রসাদকণিকা—পবিত্র, নির্মল, সরল এবং আন্তরিক। তাঁর ব্যবহৃত উপমাগুলি আমাদের চারিপাশের প্রত্যক্ষদৃষ্ট সংসারজীবন থেকে নেওয়া, ফলে তাঁর গান সর্বজনবোধ্য হয়ে উঠেছে। গভীর, গূঢ় দার্শনিকতত্ত্ব কি সহজ ভাবেই না প্রকাশিত—

নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।

ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন চিনি খেতে ভালবাসি ॥

রামপ্রসাদই 'আগমনী ও বিজয়া'-র গান রচনার প্রথম সূচনা করেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'বাংলার কুটিরের বালিকা দুহিতাদের স্বামীগৃহে যাওয়ার পর মাতৃহৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদি গঙ্গা—হরিদ্বার এই প্রসাদী সঙ্গীত।' কন্যার আগমনপথ চেয়ে মায়ের প্রতীক্ষা-ব্যাকুলতা, কাছে পেয়ে আনন্দবিহ্বলতা এবং বিদায় দিতে গিয়ে যে মর্মন্তুদ কাতরতা তার বর্ণনায় রামপ্রসাদ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কন্যা এলে তাকে আর কাছ ছাড়া করবেন না বলে মেনকা স্বামীকে জানাচ্ছেন—

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥

বালিকাবধূর পিতামাতার অশ্রু দিয়ে রামপ্রসাদ এ গান লিখেছেন। জগজ্জননী দুর্গাকে ঘরের মেয়েতে রূপান্তরিত করে তিনি মাতৃকল্পনাকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

শ্যাম ও শ্যামাকে অভিন্নরূপে কল্পনা রামপ্রসাদের বিশিষ্ট সাধকচেতনার পরিচয়বহ। 'মন করো না দ্বেষাদ্বেষি', 'কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে' ইত্যাদি পদ সর্বধর্মসমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর গান অধ্যাত্মসাধনা, বাস্তবতা ও কাব্যরসের সংমিশ্রণে এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টিকর্ম। রামপ্রসাদ যুগোত্তীর্ণ শিল্পী।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

কবিকথা ॥ শাক্তপদ-রচয়িতাদের মধ্যে রামপ্রসাদের পরেই কমলাকান্ত ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান জেলার কালনায় তাঁর জন্ম। তাঁর জন্ম-সন তারিখ নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হলে মাতুলালয়ে চলে আসেন এবং সেখানে প্রতিপালিত হন। সংস্কৃত টোলে পড়ে সংস্কৃত শিখেছিলেন। বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত এবং মন্ত্রগুরু ছিলেন। কোটালহাটে তাঁর সাধনপীঠ ছিল। পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে কালীসাধনা করতেন। তাঁর দুই বিবাহ হয়েছিল। কবি ভোগ-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে বিষয়নিস্পৃহ হয়ে আরাধ্যা দেবীর চরণে নিজেকে একেবারে সঁপে দিয়েছিলেন। উনিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁর মৃত্যু হয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

কাব্যকথা ॥ কমলাকান্ত প্রথম জীবনে 'সাধকরঞ্জন' নামে একখানি তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাতে সাধনতত্ত্ব থাকলেও সহজ কবিত্বের প্রকাশ লক্ষণীয়। শ্যামাসঙ্গীত রচনা তাঁর প্রধান কীর্তি। কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশত গান মেলে। 'আগমনী ও বিজয়া' গান রচনায় তাঁর পারদর্শিতা রামপ্রসাদের তুলনায়ও

বেশী বলা চলে। মেনকার হৃদয়বেদনা কবি অপরূপ মাধুর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ওরে নবমী নিশি, না হইওরে অবসান,' 'কি হোলো নবমী নিশি হৈলো অবসান গো,' 'ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি'—ইত্যাদি বিজয়া সঙ্গীত কন্যাবিচ্ছেদাতুরা মাতৃহৃদয়ের বেদনানির্ঝরিণী। সাধককবির ভক্তমনের অকপট প্রকাশ—

মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুমসকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমরকালো কালোয় কালো মিশে গেল।
দেখ সুখদুঃখ সমান হল আনন্দসাগর উথলে ॥—ইত্যাদি বহু গানে ঘটেছে।

অকৃত্রিম ভক্তির উৎসারে, আবেগের সংযত উচ্চারণে তাঁর গানগুলি প্রকৃতই অনবদ্য। তাঁর গানে ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের পাশাপাশি শিল্পীহৃদয়েরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর গানের ভাষা ও বিন্যাসপদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও ঘনপিনদ্ধ। সুনির্বাচিত শব্দের ধ্বনিঝঙ্কার স্বভাবতই কানকে তৃপ্ত করে। তাঁর গানে যে কল্পনা, আবেগ ও রচনারীতির সুষ্ঠু সমন্বয় দেখা যায়, তা রামপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন শাক্তপদকারের মধ্যে দুর্লভ।

বাউল

বাউল বাংলা দেশের এক বিশেষ সাধকসম্প্রদায়। 'বাউল' শব্দের অর্থ 'বায়ুগ্রস্ত' অর্থাৎ পাগল। ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা প্রায় উন্মাদের মত ব্যক্তিই যথার্থ বাউল। দশম শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তারই একটি শাখা সহজযান। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব সহজিয়া মতের উদ্ভব। এই ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত হয় মুসলমান সুফী মতবাদ। এরই পরিণামে বাউল নামক ধর্মমত ও বাউল সম্প্রদায় দেখা দেয়। শাস্ত্র চর্চা ছাড়াও মানুষ যে সত্যলাভ করে জীবনকে সুষমাময় সঙ্গীতময় করে তুলতে পারে বাউলেরা তার প্রমাণ। এঁদের পুঁথিগত বিদ্যা নেই কিন্তু হৃদয়ে দীপ্ত রয়েছে জ্যোতির্ময় আত্মার অনির্বাণ শিখা। প্রচলিত ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, রোজানামাজ এঁরা মানেন না। এঁরা বলেন—

তন্ত্রমন্ত্র বেদ পুরাণে, ঘুরায় কেবল নানান টানে,
যোগে-যাগে তীর্থস্নানে সহজ মানুষ ধরে হারাই।

সর্বসংস্কারমুক্ত সহজ জীবনবরণ করাই এঁদের সাধনার বৈশিষ্ট্য। চেতনার গভীর তলশায়ী প্রাণশক্তিকেই এঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে চান। এঁদের একমাত্র সাধ্য 'মনের মানুষ'। ভিতরে বাহিরে এঁরা মনের মানুষ খুঁজে বেড়ান—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।

বাউল সাধনার মূল কথা, মর্ত্যসত্তার মধ্যে সাঁই অর্থাৎ স্বামী বা ভগবানকে উপলব্ধি। এছাড়া, বাউলদের আরো একটি গূঢ় সাধনপদ্ধতি আছে যার কথা অ-বাউলের জানা নিষেধ। সে সাধনা নরনারীর দেহসম্পর্কনির্ভর। বাউলেরা ধর্ম ও জাতিভেদ উপেক্ষা করে। এঁদের কাছে হিন্দুমুসলমান কোন ভেদ নেই। হিন্দু বাউলগুরুর অনেক মুসলমান শিষ্য আছে আবার মুসলমান বাউলেরও অনেক হিন্দুশিষ্য আছে। বাউল-সাধকদের বহুমত ও গোষ্ঠী আছে। এদের মধ্যে 'দরবেশী', 'সাঁই', 'আউল', 'কর্তাভজা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাউলসঙ্গীত বাউলদের সাধনারই সঙ্গীত। বাউলেরা নিজেদের সাধনতত্ত্ব ও পদ্ধতি নানা উপমারূপকের মধ্য দিয়ে গানে প্রকাশ করেন। রূপকের আবরণের উদ্দেশ্য যাতে নিজগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যের কাছে তা গোপন থাকে। একতারা, ডুগি, কখনো দোতারা, গমক ইত্যাদি যোগে এই গান গাওয়া হয়। নৃত্যযোগে গান গাওয়া হয় বলে গায়কের পায়ে ঘুঙুর থাকে।

বাউল গান হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে মিলে রচনা করেছে। যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে বাঙালীর জীবন সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল বাউলের গানে উচ্চারিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ—

ভক্তি দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে
তার কাছে জাতের বিচার নাই।

হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতিমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে বাউলের গানে। রবীন্দ্রনাথের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরাণ পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।...বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনাআপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দুমুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়'। অধ্যাত্মসাধনার বাইরে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদশূন্য এই উদার মানবতাবোধে বাউল-গানের বিশিষ্টতা নিহিত।

লালন ফকির

কবিকথা॥ লালন ফকির বাউল গান রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর জীবনী সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য দুর্লভ। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। জন্মসন সুনিশ্চিতভাবে মেলে না। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। তিনি কুষ্টিয়া নিবাসী ছিলেন। এখনো কুষ্টিয়াতে তাঁর আখড়া রয়েছে। একমতে, তিনি হিন্দু কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে পথে

পরিত্যক্ত হন। তখন সিরাজসাঁই নামে এক ফকির সেবাশুশ্রূষা করে তাঁর প্রাণ বাঁচান। দেশে ফিরলে মুসলমানের গৃহে আশ্রয় নেবার জন্য হিন্দুসমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গী হতে অসম্মত হন। তখন লালন হিন্দুর কুল ও সমাজ ত্যাগ করে ফকিরি ধর্মে দীক্ষা নেন। অন্যমতে, তিনি মুসলমান বংশেই জন্মেছিলেন। অবশ্য লালন নিজে এই জাতবিচারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর একটি গানে তিনি লিখেছেন—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে ?
লালন বলে জাতের কিরূপ দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালা কেউ তসবি গলে নাই তো রে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিংবা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কারে।

সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মাচার ত্যাগ করে অতি উদার মানব ধর্মের জয়গান করেছেন সাধক ও কবি লালন।

কাব্যকথা ॥ রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম লালনের গানকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। গানগুলির সুর ও ব্যঞ্জনা কবিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কবি ও সাধক লালন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, রহস্যময় প্রতীকের দ্বারা যেমন বাউল সাধনার গূঢ় আভাস দিয়েছেন, তেমনি সাধনতত্ত্বকে কাব্যরসে উন্নীত করেছেন। কবি যখন বলেন—

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
(ওরে) আঁধার ঘরে জলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে॥

—তখন এর আড়ালে বাউল-সাধনার ইঙ্গিত থাকলেও ভাব ও ভাষার অপূর্ব সম্মিলনে তা চমৎকার কাব্যরসের আস্বাদ দেয়। তাঁর গানে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মানুমোদিত পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যাবে। কোথাও তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবভাবের বশে রাধাকৃষ্ণের কথা লিখেছেন—

কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই।
একবার এসে দেখা দে রে প্রাণ জুড়াই॥

কখনো বা সুফী ভক্তির বশে বলেছেন—

নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়।
সেই যে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়॥

তাঁর গান স্নিগ্ধ গীতিমূর্ছনায় পূর্ণ, ভাবের গভীরতা ও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ এবং মানবিকতাবোধে দীপ্ত।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস বর্ণনা কর।

২. চর্যাপদের সমাজচিত্র ও সাহিত্যসম্পদের পরিচয় দাও।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের গুরুত্ব দেখাও।
[উ. মা. '৮৩]

৪. বিদ্যাপতির পদাবলীর সমাদরের কারণ কী ? তাঁর জীবনী ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। [উ. মা. '৭৮, '৮৪]

৫. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের অবদান আলোচনা কর।
[উ. মা. '৮০]

৬. বাংলা রামায়ণের আদি কবি কে ? কবির পরিচয় এবং কাব্যরচনাকাল সম্পর্কে যেসব উল্লেখ ঐ রামায়ণে রয়েছে, তা বিবৃত কর। বাঙালী জীবনে এ কাব্যের প্রভাব কতখানি নির্ণয় কর। [উ. মা. '৮০]

৭. ভাগবতপুরাণের প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেছিলেন, তাঁর নাম উল্লেখ কর। তাঁর জীবন ও কাব্য সম্পর্কে যা জান তা লেখ। [উ. মা. '৭৯]

৮. মঙ্গলকাব্য কাকে বলে ? 'মঙ্গল' শব্দটির অর্থ কি ? মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি লেখ ? মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ আলোচনা কর। [উ. মা. '৭৮, ৮২]

৯. মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগের বাঙালীর যে জীবনযাত্রার পরিচয় পাও, তা লেখ।

১০. মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ। এ ধারার যে কোন একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও। [উ. মা. '৮২]

১১. বৈষ্ণবসাহিত্যে চৈতন্যের প্রভাব নিয়ে আলোচনা কর। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় চৈতন্যের প্রভাব কতোখানি পড়েছিল লেখ।
[উ. মা. '৭৯, '৮১, '৮৩]

১২. বাংলার সমাজজীবনে চৈতন্যের প্রভাব দেখাও।

১৩. চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের পরিচয় দিয়ে মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তা আলোচনা করে দেখাও। এ ধারার প্রধান প্রধান কবিদের নাম কর।
[উ. মা. '৭৮]

১৪. শ্রীচৈতন্যের বাংলা ভাষায় রচিত মুখ্য চরিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ করে কোন্‌খানিকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর, কারণসহ তা আলোচনা কর।
[উ. মা. '৭৮, '৮০]

১৫. বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের বিশেষত্ব কি ? তাঁকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলার কারণ কি ? তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। [উ. মা. '৭৯, '৮২]

১৬. জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয় কেন ? তাঁর কাব্যপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। চৈতন্যপরবর্তী দুজন পদকর্তার কবিকৃতিত্ব লেখ। [উ. মা. '৮০, '৮৩]

১৭. বাৎসল্য রসের পদরচনায় কার কৃতিত্ব বেশী ? তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখ।

১৮. ধর্মমঙ্গল কাব্য কাকে বলে ? এই কাব্যের কাহিনীর পরিচয় দাও। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে ? তাঁর জীবনী ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

১৯. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে ? তাঁর জীবনী ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

২০. আরাকান রাজসভার কবিদের কাব্যকৃতির পরিচয় দিয়ে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা নির্দেশ কর এবং এই রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবির কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

২১. ভারতচন্দ্রের কাব্যে সমকালীন যুগ কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, আলোচনা কর। ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা কোথায় দেখাও।

২২. 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কাহিনী লেখ। এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ নির্ণয় কর।

২৩. শাক্তপদাবলীর সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ কর। শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি কে ? তাঁর জীবনী ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

২৪. বাউল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কি ? লালন ফকির সম্পর্কে যা জান লিখ।

২৫. টীকা লেখ :—সন্ধ্যা ভাষা, বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর,শ্রীকর নন্দী, চাঁদসদাগর, বেহুলা, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজমাধব, চৈতন্যভাগবত, লোচনদাস, জয়ানন্দ, বলরাম দাস, রূপরাম চক্রবর্তী, আগমনী ও বিজয়া, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, বাউল গান, লালন ফকির।